নজদী আন্দোলনের নুতন পুরাতন ইতিহাস
বনাম

নজদী পরিচয়

রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী
বাংলাবাজার-ঢাকা

বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কর্তৃক মনোনীত ও স্বীকৃত।

নজদী পরিচয়

(ওহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস)

প্রনেতা
মোহাম্মদ রেদওয়ানুলহক ইসলামাবাদী

প্রকাশনায়
রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী
৩৮/২ (গ) বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩৭৬২০, ২৮৩০২৬

প্রকাশক
সাইফুল ইসলাম
১৫ নং কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ—নভেম্বর ১৯৯০ ইং

প্রকাশক কর্তৃক সব স্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৩৫,০০

মুদ্রণে ঃ
রেদওয়ানিয়া প্রেস
বাংলাবাজার ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা ঃ "নজদ" পরিচিতি

বর্তমান সৌদী আরবের পূর্বাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের নাম "নজদ"। এদেশের অধিবাসীগণ ঐতিহাসিক ভাবে ইসলামের ঘোর শত্রু। ইসলামের প্রারম্ভিক কাল হতেই এরা মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল খুন খারাবি, রাহাজানি, অবৈধ যুদ্ধ পরিচালনা, ইসলাম বিদ্বেষ ইত্যাদি। এদের জীবন যাত্রার প্রণালী ছিল পশু চারণ, দস্যুবৃত্তি, মূর্খতা ও যাযাবরি। এখান থেকে উৎপত্তি হয়েছিল শয়তানের শিং মোসালিমা কাজ্জাব নামের ভন্ড নবী ও আবদুল ওহাব নজদী নামের ভ্রান্ত ফেরকার উদ্ভাবক।

প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এদের সম্পর্কে বদদোয়া করেছেন ফলে, ঐ অঞ্চলে আজ পর্যন্ত কোন ধর্ম প্রাণ লোকের জন্ম হয়নি এবং তৈল সম্পদ ও এই প্রদেশে আবিস্কৃত হয় নি। নজদবাসীগণ আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী হুজুরে পাক (দঃ) কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ার বহু কারনের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখ যোগ্য ঃ

(১) নজদের প্রধানতম মুরব্বী শেখ নজদী মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছিল। যার কথা আল্লাহ পাকের কোরআন মজিদে বিশেষ ভাবে উল্লেখ রয়েছে।

(২) নজদ হতে মুসালিমা কাজ্জাব নামে এক ভন্ড নবী হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর খেলাফত কালে ইসলামের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। যারকথা ইসলামের ইতিহাসে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

(৩) সাহাবা বিদ্বেষী এই দেশবাসী বীরে মাউনাতে সুশিক্ষিত সত্তর জন সাহাবীকে নির্মম ভাবে বিনা কারণে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার পর হুজুরে পাক (দঃ) নামাজের মধ্যে কুনুতে নাজেলার মাধ্যমে নজদীগণের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

(৪) ১১১১ হিজরীতে আবদুল ওহাব নজদী নামের এই দেশের এক ব্যক্তি ইসলামের বড় এক ফেতনা। ইবনে সউদ ছিল তার সম্পর্কীয় ভগ্নিপতি। এই দুব্যক্তি দস্যু বাহিনী গঠন করে নজদ ও হেজাজের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে, বহু সুন্নী ওলামায়ে কেরাম, হাফেজ, কারীকে হত্যা করেছে, বহু প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরামের মাজার শরীফ ধ্বংস করেছে এবং দুনিয়া ব্যাপি ওহাবী আন্দোলন পরিচালনা করেছে। যার অনুসারী বর্তমান সৌদী শাসক বাদশাহ (ফাহদ) পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। তারা ইসলামী মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন। তারা ইসলামের গনতন্ত্রকে হত্যা করে স্বেচ্ছাচারী ও বিলাস প্রিয় রাজতন্ত্র কায়েম করেছে। তাদের সহায়ক শক্তি হল ইহুদী, নাসারা, সাবাইন ও নাস্তিক সম্প্রদায়। সুতরাং এই ধীকৃত জাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আজ সময় এসেছে। উপরোক্ত বিষয় সমূহ উক্ত বইয়ে আমরা সবিস্তার আলোচনা করেছি। আমাদের এতদ্দেশে নজদী ওহাবী পন্থী দেওবন্দ মাদ্রাসার কতিপয় আলেম উল্লেখযোগ্য। এদের লিখিত ফতুয়ায়ে রশিদিয়া ওহাবী মতবাদের অন্যতম পুস্তক। শরীয়ত তরীকত পন্থী ওলামাগন ওহাবী মতবাদীদের ফতুয়া ও তাদের অনুসারীদের সংশ্রব হতে দূরে থাকার কথা তাকিদ দিয়ে বলেছেন। অন্যথায় ঈমান আকীদা বিনুষ্ট হয়ে যাবে। রোজা নামাজ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করেও কোন সার্থকতা হাসিল করা যাবেনা।

হযরত রাসূলে আকরম (দঃ) বলেছেন আমার উম্মতগণ ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হয়ে যাবে। তম্মধ্যে আহলে সুন্নাতের জামায়াতই সমুন্নত ও বেহেশতী ফের্কা হবে। নজদী, খারেজী, ওহাবী প্রভৃতি সকল ফের্কা ভ্রান্ত এবং দোযখী হবে। এরা শয়তানের মত শুধু আল্লাহ পাকের পূজারী, তারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে যথাযত ভাবে বিশ্বাস করেনা। আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাকে সকল বাতিল ফের্কা হতে হেফাজত করুন, আমীন।

আরজ গোজার
মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী

নজদী পরিচয়ের সূচীপত্র

প্রথম পাঠ

বিষয় — পৃষ্ঠা
○ কুফরী মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের সূচনা। ১
○ শেখ নজদীই মহানবী (দঃ) কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। ২
○ মহানবী (দঃ) কে প্রানে বধ করার জন্য শেখ নজদীর দারুন নদওয়ায় পদার্পন। ৪
○ মহানবী (দঃ) কে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ী ঘেরাও। ৭
○ নজদের মাটিতে নজদীগণ ৭০ জন সাহাবা কেরামকে নির্মমভাবে হত্যা করার ঘটনা। ১০
○ নজদের রেজীতে সাহাবা হত্যার ঘটনা। ১৪
○ মসজিদে যেরারে নবী (দঃ) কে হত্যার সংকল্প। ১৫
○ যেসব হাদীসে নজদীগণ অভিশপ্ত। ১৯
○ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর কুকীর্তি। ২৬
○ ফতোয়া শামীতে নজদী পরিচয়। ২৭
○ তাফসীর সাবীতে ওহাবী ফের্কা। ২৮
○ ওহাবী ফের্কার সমর্থনে দেওবন্দী মৌলভী। ২৯
○ দেওবন্দী ফতোয়ার জবাবে ওলামায়ে হারামাইন। ৩১
○ যেসব দেওবন্দী আলেম ওহাবী ফের্কার বিরুদ্ধে ছিলেন। ৩২
○ মুফতী শফী সাহেবের ফতোয়ায় দেওবন্দীগণ ধর্মচ্যুত। ৩৪
○ নবীর কুৎসাকারীর শাস্তি হত্যা ও কতল। ৩৬
○ ধর্ম কুৎসাকারী দেওবন্দীগণ তওবা করে ছিলেন কিনা। ৩৭
○ ব্রিটিশ সম্রাটের ডায়েরীতে ওহাবী পরিচয়। ৪০

বিষয় পৃষ্ঠা
○ তরখানের ডাক বাংলায় মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী। ৪১
○ নজদী ও শিয়ার তর্ক বহছ। ৪২
○ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সুফিয়ার যাঁতাকলে পড়ে শরাব পান। ৪৪
○ ওহাবী মাযহাব স্বপ্নে পাওয়া মাযহাব। ৪৬
○ ওহাবী আন্দোলনের ৬দফা কর্মসূচী। ৪৮
○ ওহাবী আন্দোলনের ৬দফার দুরাবস্থা। ৪৯
○ ওহাবী নজদীর সংস্কারে বাংলা একাডেমী! ৫২
○ ওহাবী ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উপর আল্লাহর গজব। ৫৫
○ খারেজী মাযহাবের উৎপত্তি কাল। ৫৭
○ নজদী প্রনীত কিতাবুত তাওহীদে বহু কুফরী কালাম। ৫৮
○ নজদী প্রনীত কাশফুশ শুবহাতের কুফরী কর্ম। ৫৯
○ কাশফুশ শুবহাতের ধারাবাহিক কুফরী কর্ম। ৬১
○ নবী (দঃ) ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দেশিত ছিলেন তাওহীদ প্রচারের জন্য নয়! ৬৩
○ মহনবী (দঃ) এর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পত্র আহবান। ৬৭
○ রোম সম্রাটের সঙ্গে প্রিয়নবী (দঃ) এর পত্রালাপ। ৬৯
○ রোম সম্রাটের নিকট ইসলামী দাওয়াত। ৭০
○ মৌলবাদের জন্ম কথা। ৭৪
○ ধর্ম পন্থী ও খোদা পন্থীর পার্থক্য। ৭৯
○ দীনে তাওহীদ এর মোকাবেলায় ইসলাম ধর্ম। ৮৫
○ নজদী ওহাবীরা মূর্তি পূজা করতো। ৮৬
○ তরীকত শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার। ৯০
○ বাইয়াতে রাসূল ও বাইয়াতে সাহাবা। ৯১
○ ওহাবী তরীকত এর সূচনা। ৯৩

বিষয় পৃষ্ঠা
○ আকবরের দীনে এলাহী ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকার দ্বন্দ্ব। ৯৪
○ তরীকত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)। ৯৫
○ শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর শিক্ষা দমন। ৯৭
○ ভারত বর্ষে ওহাবী ফের্কার উদ্ভব। ৯৮
○ দিল্লীর মসজিদে ওহাবী সুন্নীর প্রথম বহছ। ১০০
○ সৈয়দ আহাম্মদ বেরেলভী আল্লাহর হাতে মুরীদ হলেন কি করে! ১০১
○ আল্লাহ পাকের কোন তরীকা আছে? ১০৩
○ সূফী মাওলারা নূর মোহাম্মদের পূর্ব পুরুষ ও বংশ পরিচয়। ১০৫
○ তরীকত পন্থী সুন্নী ইমামগণের নাম। ১০৯
○ মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর মুরীদানগণ। ১১২
○ মাওলানা রুহুল আমীনের সঙ্গে ওহাবীগণের বহছ। ১১৪
○ সৈয়দ আহাম্মদ বেরেলভী কেন শহীদ হন নি। ১১৭
○ তরীকায়ে আওর মোহাম্মদীয়ার সঠিক রূপ। ১১৯
○ কবর স্মৃতি নির্মানের শরীয়ত সম্মত বিধান। ১২১
○ মাজার নির্মানের পট ভূমিকা। ১২৩
○ হযরত ওমর (রাঃ) এর বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শন। ১২৪
○ কবর পাকা করার মূল উৎস। ১২৭
○ কবরের পার্শ্বে নামাজ পড়া শরীয়ত সম্মত। ১৩০
○ দারুল আরকম কি? ১৩৪
○ জান্নাতুল মোয়াল্লার কবর স্থান। ১৩৮
○ ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর। ১৪১
○ জান্নাতুল বাকীর কবর স্থান। ১৪৩
○ মৌলবাদী শক্তির কালো মুখ। ১৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
○ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ।	১৪৯
○ মৌলবাদী শক্তির সূচনা কাল।	১৫০
○ দমে দমে আল্লাহু।	১৫০
○ একজন মৌলবাদী ওয়ায়েজের ঘটনা।	১৫৭
○ আদম ও শয়তানের লুকোচুরী।	১৬০
○ খারেজী মাযহাব ও ইহুদী মাযহাব।	১৬৪
○ ওহাবী মাযহাবের হলপ নামা।	১৭০
○ দেওবন্দী মাযহাবে ভোট দিন।	১৭১
○ দেওবন্দী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য।	১৭৩
○ দেওবন্দ পরিচিতি।	১৭৪
○ দেওবন্দে হুজুরে পাকের তাশরীফ আনয়ন।	১৭৬
○ হারামকে হালাল করার নিয়ম।	১৭৭
○ সুদের টাকা হালাল করার নিয়ম।	১৭৮
○ হারাম দুধ ও মাংসে হালাল করার নিয়ম।	১৭৮
○ কাকের মাংস হালাল করার হীলা।	১৮০
○ কাকের মাংস হালাল হওয়ার যৌক্তি।	১৮১
○ মিলাদ কেয়াম নিয়ে উস্তাদ সাগরিদের লড়াই।	১৮২
○ মিলাদ শরীফের পুস্তক পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা।	১৮২
○ দেওবন্দী প্রথম ইমাম ইসমাইল খারেজী।	১৮৫
○ দেওবন্দী দ্বিতীয় ইমাম কাশেম কাদিয়ানী।	২৮৭
○ দেওবন্দী তৃতীয় ইমাম রশিদ গঙ্গুহী।	১৮৯
○ দেওবন্দী চতুর্থ ইমাম খলিল আহাম্মদ নাস্তিক।	১৯০
○ দেওবন্দী শেষ ইমাম আশরাফ আলী থানভী।	১৯২
○ আশরাফ আলীর ঘোষণায় মহানবী ক্ষুদ্র জ্ঞানী ছিলেন।	১৯৩
○ থানভী ও থানাবন এর মর্যাদা।	১৯৬
○ দেওবন্দীগণ তিন দলে বিভক্ত।	১৯৮
○ আশরাফ আলীর ফতোয়ায় সকল দেওবন্দী।	১৯৯

প্রথম পাঠ

কুফরী মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ। পবিত্র ইসলাম-ই হল মহান আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। ৬১০ খৃষ্টাব্দে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর বয়স যখন ৪০ বছরে উপনীত হল মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি তার পর হতে এ ধর্ম মত প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথম তিন বছর পর্যন্ত তিনি এ প্রশংসনীয় ধর্মটিকে অতি গোপনে গোপনে প্রচার করতে থাকেন। এ সময়ের মধ্যে যে সামান্য সংখ্যক লোক এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা অতি সংগোপনে তা পালন করতেন। অতঃপর যখন তা প্রকাশ্যে প্রচারের জন্য আদিষ্ট হয়ে কুরাইশদেরকে প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন, তখনই তাদের শত্রুতার মাত্রা বেড়ে গেল।

○ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (দঃ) এর গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার দেখে কুরাইশ গোত্র প্রধানগণ হুজুরে পাক (দঃ) এর আস্তানায় উপস্থিত হয়ে আপত্তি জানাল যে, আপনি এই নতুন ধর্মটি প্রচার করবেন না! কারণ এ-তে আমাদের ধর্মমতের বিরোধিতা করা হচ্ছে। তাই আমরা ইচ্ছ করছি যে, যদি আপনি নতুন ধর্মমত প্রচার থেকে বিরত থাকেন তবে আপনাকে বহু ধন সম্পদ দিব। যাতে আপনি আরব বিখ্যাত ধনী হয়ে যাবেন এবং আপনি ইচ্ছে করলে আপনার মনের আনন্দ উপভোগের জন্য আরব বিখ্যাত সুন্দরী সুন্দরী রমনী আমরা আপনার খেদমতের জন্য নিযুক্ত করে দিব। আপনি যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে এ সব এখনই আপনার দরবারে উপস্থিত করা হবে!

৩ আর একটি হাদীসের বর্ণনায় দেখা যায় যে, কুরাইশগণ হুজুরে পাক (দঃ) এর সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত সন্ধি করতে চেয়েছিল।

১। কুরাইশগণ হুজুর পাক (দঃ) কে বলল, এক বছর আপনি আমাদের লাত, ওজ্জা প্রভৃতি ভূতের পূজা করবেন, তা হলে অপর বছর আমরা আপনার এক খোদার ইবাদত করবো। হুজুর (দঃ) ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের আলাপ আলোচনা চলছিল এমতবস্থায় সে আলোচনা মজলিসের মধ্যে হুজুরের চাচা "আসওয়াদ" ও "ওলিদ" উপস্থিত হয়ে বলল, হে মোহাম্মদ! উপরে উল্লেখিত দু'টি প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য আমরা তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। হুজুরে পাক (দঃ) সুরায়ে "কাফেরুনের" নির্দেশ মোতাবেক কুরাইশগণকে উত্তর দিলেন যে, আমি মানুষের হাতে গড়া প্রতিমার পূজা করতে পারি না।

অতঃপর কুরাইশগণ হুজুরে পাক (দঃ) হতে এ উত্তর শ্রবন করে তারা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে গেল। একদা হুজুরে পাক কা'বা শরীফের পথে রওনা হলেন। কুরাইশগন তাঁকে একা দেখে পথের মধ্যে বহু অপমান করে। এমনকি তাঁর গলার মধ্যে রশি লাগায়ে টানা হেঁচড়া শুরু করে। এমনকি উপস্থিত সকলেই যে যেভাবে ইচ্ছে নবী করীম (দঃ) কে বিভিন্ন অপমান সূচক ব্যবহার ও গালাগালী করল।

অপর একদিন হুজুরে পাক (দঃ) কা'বার আঙ্গিনাতে নামাজ পড়ছিলেন, হঠাৎ একদল কুরাইশ কা'বার আঙ্গিনায় উপস্থিত হয়ে সিজদা অবস্থায় রাসূলে পাকের পিঠের উপর উটের নাড়ীভুড়ী রেখে হৈ চৈ শুরু করে। হুজুর নাড়ীভুড়ীর ওজনে মাথা উত্তোলন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। এই রূপ আরো অপমান সূচক আচরণ ও ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআন ও হাদীসের পাতায় পাতায় স্বর্ন অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মহানবী (দঃ) এত লাঞ্ছিত নির্যাতিত হন। তারপরেও আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রচার বন্ধ করেন নি।

২। অন্যদিকে কুরাইশ কাফেরগণ হুজুরে পাক (দঃ) কে প্রাণে বধ করার জন্য দারুন নদওয়া নামক স্থানে একত্রিত হয়ে শলা পরামর্শ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শেখ নজদীর কুপরামর্শ মোতাবেক তাঁকে হত্যার সংকল্পে তাঁর বাস ভবনও ঘেরাও করে। যার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন।

শেখ নজদী কর্তৃক নবী হত্যা কর্মসূচী

মহানবী হুজুর (দঃ) এর ইসলাম প্রচার এর পরিপ্রেক্ষিতে কুরাইশ কর্তৃক তিনটি পরিকল্পনা বা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় (১) প্রথম পরিকল্পনা ছিল মহানবীকে শর্তসাপেক্ষে নিজ দেশে-নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত রাখবে (২) দ্বিতীয় কর্মসূচী ছিল তাঁকে হত্যা করা হবে (৩) তৃতীয় কর্মসূচী ছিল তাঁকে মক্কা হতে বিতাড়িত করা হবে। এই তিনটি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পরিকল্পনা (হত্যা) কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মহনবীর বাড়ী ঘেরাও করা হয়, তার বিস্তারিত আলোচনা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের মধ্যে নিম্ন আয়াতে বর্ণনা করেন।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَا
كِرِينَ ۔ (سورة الانفال ٣٠)

আল্লাহ পাক বলেন হে নবী! কুফ্‌ফারে মক্কা আপনার সম্বন্ধে তিনটি কর্মসূচী গ্রহন করেছে। ১। শর্ত সাপেক্ষে আপনাকে নিজ দেশে বহাল রাখবে। ২। আপনাকে নিজ ঘরের মধ্যে হত্যা করবে। ৩। আপনাকে মক্কা হতে বের করে দিবে। আল্লাহ পাক বলেন: হে আমার প্রিয় হাবীব! আমি কাফেরদের উপরে উল্লেখিত তিনটি চক্রান্তই ব্যর্থ করে দিব।

নবী হত্যায় শেখ নজদীর কুপরামর্শ ঃ মক্কার পূর্ব প্রান্তে শেখ নজদী নামে একজন বৃদ্ধ বসবাস করতো। বয়সের দিক দিয়ে সে সকুনের বয়স হতে দীর্ঘায়ু ছিল। তার নাম যাই থাকুক না কেন সে শেখ নজদী নামে খ্যাত ছিল। এই কমবখত মরদুদের আমলে "বসুস" নামক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আর তারই আমলে সেই যুদ্ধটি ৪০ বছর পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে অবসান ঘটে। এই যুদ্ধের অবসানের পর আর একটি আরব বিখ্যাত যুদ্ধ শুরু হয়, সে যুদ্ধে ৭০ হাজার মানুষ অযথা যুদ্ধ করে প্রাণ হারায়। এই যুদ্ধটির ৫৩৪ ইং সনে অবসান ঘটে। এ ছাড়া আরবের মধ্যে যত আপত্তিকর ঘটনা ঘটতো প্রত্যেক ঘটনাতেই এ কুট বৃদ্ধের কিছু না কিছু পরামর্শ থাকতো। এই কুটনা বৃদ্ধের কুপরামর্শেই আবু জেহেল হুজুরে পাককে প্রাণে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

দারুন নদওয়াতে শেখ নজদীর পদার্পন

দারুন নদওয়ার কমিটি সেন্টারে নবী হত্যার আলোচনা চলছিল। হঠাৎ সে মজলিসের মধ্যে আগমন করলো শয়তান শেখ নজদী। তার আগমনে সকল আরব গোত্র প্রধানগণ অত্যান্ত খুশী হলো। স্বয়ং আবু জেহেল সভাপতির আসন ছেড়ে দিয়ে নীচে বসল, আর সভাপতির আসনে বসালো শেখ নজদীকে। এই কুটনা বৃদ্ধ বলল, হে আরব গোত্রগণ! তোমরা কেন দারুন নদওয়াতে সমবেত হয়েছ, তা আমি নজদে বসেও জানি। আমার এই বৃদ্ধাবস্থায় যেখানে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে তোমাদের এই অধিবেশনটি বড় গুরুত্ব পূর্ণ বিধায় আমি বহু কষ্টে উপস্থিত হয়েছি। বিশ্বস্ত তাফসীর কারকগণ লেখেন এই বদ বৃদ্ধ দারুন নদওয়া কমিটিতে শীতের দরুন কম্বল পরিধান করে উপস্থিত হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত শেখ নজদীর সভাপতিত্বে দারুন নদওয়ার সভা চললো। শেখ নজদী দাড়িয়ে বলল যে, তোমরা যে কাজে উপস্থিত হয়েছ এখন

তোমরা সে কাজে মনোনিবেশ কর। অতঃপর আবু জেহেল দাঁড়িয়ে বলল, হে মান্যবর, আমাদেরই মধ্যকার আবদুল্লার পুত্র (মোহাম্মদ) 'ইসলাম" নামে একটি নতুন ধর্মের প্রচার আরম্ভ করেছে। সে গোপনে গোপনে আমাদের অনেক লোককে তার ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলেছে। দিন দিন তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি সে তার গোত্রের আরব প্রখ্যাত নেতা আবু লাহাবকেও তার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহবান জানাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা নীরবতা অবলম্বন করলে একদিন হয়তো সকল আরব গোত্র তার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাবে। তাই এখন কি করতে হবে পরস্পর পরামর্শের জন্য আমরা দারুন নদওয়াতে সমবেত হয়েছি। হে মাননীয় শেখ! আপনি যখন উপস্থিত হয়েছেন, তখন আমাদেরকে ইহা থেকে পরিত্রান লাভের জন্য একটি সুপরামর্শ দিবেন এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

অতঃপর হারামজাদা শেখ নজদী আবু জেহেলের আবেদনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দারুন নদওয়ায় উপস্থিত জনতাকে বলল, মোহাম্মদ যে ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছে, তা যদি অংকুরেই বন্ধ না করা হয় তবে অচীরেই ইসলাম ধর্ম সারা আরবে বিস্তৃত হয়ে পড়বে। তাই মোহাম্মদের ধর্ম প্রচারকে প্রথমেই রুখতে হবে। সুতরাং এখন তোমরা মোহাম্মদ সম্বন্ধে কি করতে চাও। প্রত্যেক আরব গোত্র প্রস্তাব উথ্যাপন কর। শেষ সমাধানটা আমিই দিব। শেখ নজদীর নির্দেশ মোতাবেক দারুন নদওয়ায় আরব প্রধান উপস্থিত জনতা নিম্নোক্ত স্ব-স্ব প্রস্তাব উথ্যাপন করে।

১। **প্রথম প্রস্তাব ঃ** মহানবীর ইসলাম প্রচারের বিরুদ্ধে এক আরব গোত্র বলল, মোহাম্মদ (দঃ) কে দমন করতে হলে তাঁর হাত পা বেধে কোন একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে মোহাম্মদের ধর্ম প্রচার বন্ধ হবে।

শেখ নজদী মঞ্চের আসন হতে ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, উক্ত প্রস্তাবটি আমার মোটেই গ্রহণযোগ্য হল না। কারণ মোহাম্মদের সাথীগণ যখন শুনবে যে, তাদের নবী ঘরে আবদ্ধ আছে তখন তারা জানে প্রাণে চেষ্টা

করে তাঁকে তথা হতে উদ্ধার করে নিবে। এ প্রস্তাবের কথাটি কোরআনের মধ্যে নিম্ন বাক্যে এরূপ বলা হয়েছে।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ -

হে আমার হাবীব। কাফেরগণ আপনাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার পরিকল্পনা করেছে। তাই এখন থেকে আপনি সতর্ক থাকুন।

২। **দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ** এক গোত্র প্রধান বলল, মোহাম্মদকে দেশ ত্যাগী করা হউক। সে যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাক। শেখ নজদী বলল, এ প্রস্তাবটি অসম্পূর্ণ। শেখ নজদী কসম করে বলল, আমি জানি মোহাম্মদের কথা ও ভাষা অতি মিষ্টি। তাঁর কথায় প্রত্যেকের মন মুগ্ধ হয়ে যায়। সে যেখানেই থাকনা কেন তাঁর আলাপ আচরণে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর দল বৃদ্ধি পাবে। তখন সকল আরব গোত্রের উপর আক্রমণ চালাবে। কাফেরদের এই পরিকল্পনার কথা আল্লাহ্ পাকের কোরআনে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে।

كقوله تعالى اَوْ يُخْرِجُوْكَ -

হে হাবীব! আপনাকে মক্কা শহর হতে বের করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হচ্ছে।

৩। **তৃতীয় প্রস্তাব ঃ** এই প্রস্তাবটি উথ্যাপন করল আরব নেতা আবুজেহেল। সে শেখ নজদীকে লক্ষ্য করে বলল যে, পূর্ববর্তী প্রস্তাবদ্বয় আমারও মনঃপুত হয় নি। কেননা মোহাম্মদকে ঘরে বেঁধে রাখা বা বহিস্কার করা জীবিত রাখারই নামান্তর। এখন আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি। শেখ নজদীকে বলল, মান্যবর আপনার মনঃপুত হলে গ্রহণ করবেন, নচেৎ প্রত্যাখান করে দিবেন। উহা হল এই যে, আমি চাই যে, মোহাম্মদকে হত্যা করা হউক। শেখ নজদী বলল, এখনই সঠিক প্রস্তাব

উথ্যাপিত করা হল। তবে এই প্রস্তাব খানা আমি আংশিক মেনে নিলাম। কারন মোহাম্মদকে হত্যা করা বড় কথা নয়, কেননা তাঁর মত কতই লোক দৈনন্দিন হত্যা হচ্ছে। তাই আমার মত বয়বৃদ্ধের পাকা বুদ্ধি এই যে, মোহাম্মদকে নিদ্রা অবস্থায় হত্যা করা হউক। আবুজেহেল হাতে তালী দিয়ে শেখ নজদীর প্রস্তাবকে মেনে নিল এবং পরস্পর সকল আরব গোত্র সকলেই তার প্রতি সমর্থন জানাল। আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীবের হত্যাকে কোরআনের মধ্যে لِيَقْتُلُوْكَ শব্দে ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ হে নবী! আপনাকে হত্যা করার ব্যবস্থা চলছে।

মহানবী (দঃ) এর বাড়ী ঘেরাও ঃ দারুন নদওয়া নামক বৈঠক হুজুরে পাক (দঃ) এর হত্যার প্রস্তাব পাস হওয়ার পূর্বেই হুজুরে পাক (দঃ) জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক কাফেরদের কুকান্ড সম্পর্কে অবহিত করা হলো এবং পরবর্তীতে কি করতে হবে তাও জানায়ে দেয়া হল। এ দিকে একরাত্রে আবুজেহেলের নেতৃত্বে প্রত্যেক আরব গোত্র হতে কিছু সংখ্যক লোক তীর তরবারী হাতে নিয়ে হুজুরে পাক (দঃ) এর বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আমীন হুজুরে পাক (দঃ) কে কাফেরদের এ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথাও জানায়ে দিলেন। তাই হুজুরে পাক (দঃ) ঐ রাত্রে নিজ শয়ন কক্ষে তাঁর চাদর গায়ে জড়ায়ে হযরত আলীকে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকার জন্য আদেশ দিলেন এবং তাকে আরো বললেন যে, আমার আর মক্কাতে অবস্থান সম্ভব নয়। হে আলী (রাঃ) আমার নিকট মক্কাবাসীদের যে আমানত সংরক্ষিত রয়েছে তা স্ব স্ব আমানতকারীকে প্রদান করে তিনদিন পর তুমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে এসো। হুজুরে পাক (দঃ) হযরত আলীকে এ নির্দেশ দেওয়ার সময় দেখেন কাফেরগণ বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হুজুর আপনি নির্দেশ করুন আমি একটু কাফেরদেরকে আপনার বাড়ী ঘেরাওয়ের মজা দেখায়ে দেই। হযরত রাসূলে পাক (দঃ) বললেন, কোন ভয় নেই, আল্লাহ আমার সহায়ক রয়েছে। এই বলে

হুজুরে পাক (দঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে স্বীয় পায়ের তলা হতে এক মুষ্টি বালি নিয়ে কাফেরদের প্রতি ছুড়ে মারলেন। আর অমনি ঐ বালু কণাগুলো কাফেরদের চক্ষুতে পড়ে সকলেই অন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) তাদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে নিজ বাড়ীর সীমা ত্যাগ করে হযরত আবুবকর (রাঃ)এর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। হযরত আবুবকর (রাঃ) কে পূর্ব হতেই অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাই তাঁরা এতদ্‌উদ্দেশ্যে রাত্রিতেই (গারে হেরা) হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে উপস্থিত হন।

হুজুরে পাক (দঃ) স্থান ত্যাগ করার পর কাফেরগণ তাঁর বাড়ী তল্লাশী দিল সেখানে দেখে যে, হযরত আলী (রাঃ) হুজুরে পাকের বিছানায় চাদর জড়ায়ে শুয়ে আছেন। অতঃপর তারা হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করলো "মোহাম্মদ কোথায়" ? তিনি উত্তর দিলেন হুজুরতো এখনই তোমাদের মধ্য দিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। এ দিকে মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে ছুর নামক গুহাতে এসে আত্ম গোপন করলেন। অতঃপর পরদিন হতে ২/৩ দিন পর্যন্ত কাফেরগণ সে গুহার চতুর দিকে বহুবার অনুসন্ধান করলো কিন্তু কোন খোঁজ পেলো না। হযরত রাসূলে পাক (দঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ) উভয়ে তিন দিন পর্যন্ত গারে ছুরের মধ্যে অবস্থান করার পর চতুর্থ দিনে উল্টা পথে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। অতঃপর মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় এসে পৌঁছলে মদীনাবাসীগণ হুজুরে পাককে স্বাগতম জানালেন। যাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় হিজরত।

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় হিজরত করার পর হতে মক্কা ও মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। মদীনাবাসীগণ হুজুর পাক (দঃ) কে মক্কা হতে বের করার কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করে। এ নিয়ে মক্কা ও মদীনার মধ্যে বহু যুদ্ধও সংগঠিত হয়। মক্কার কাফের নেতাদের মধ্য হতে যারা হুজুরে পাক (দঃ) এর বাড়ী ঘেরাও করে

ছিল তাদের মধ্যকার ২৪ জন আরব নেতা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারায়ে জাহান্নামী হয়।

পাঠকবৃন্দ ঃ এখন চিন্তা করুন কুফ্‌ফারে কুরাইশ ইসলাম প্রচারকে কেন্দ্র করে নানা নাশকতা মূলক কাজে লিপ্ত হয়েছিল বটে তবে এ সবের মূলে কোন ব্যক্তির অধিক হাত ছিল তা প্রনিধান যোগ্য!

সাধারণ আরব গোত্র প্রধানগণ চেয়েছিল যে, শুধু ইসলামের নতুন ধর্ম প্রচার বন্ধ করা। কিন্তু তাদের লক্ষ্য ছিল না মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) কে প্রাণে হত্যা করা। কারণ তারাতো প্রস্তাব দিয়েছিল নবীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা অথবা দেশ হতে বহিস্কার করা। কিন্তু চরমপন্থী আবুজেহেল ও নজদের অধিবাসী শেখ নজদী কুটনার কুমন্ত্রনায় সাধারণ আরবগণ হুজুরে পাক (দঃ) কে প্রাণে বধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। প্রকৃত পক্ষে বিচার করতে গেলে নবী হত্যা প্রস্তাবের জন্য একমাত্র দায়ী ব্যক্তি হল শেখ নজদী। এই এক ব্যক্তি যে নবীকে নিদ্রা যাপন অবস্থায় হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। শেখ নজদীর মতও আবুজেহেল হুজুরে পাক (দঃ) এর হত্যার প্রস্তাব করে। কিন্তু শেখ নজদীই রাসূলে পাক (দঃ) কে নিদ্রা যাপন অবস্থায় হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। শুধু তাই নয় অনেক সাহাবায়ে কেরামকেও নজদ বাসীরা হত্যা করেছিল যার বিবরণ পরবর্তীত দেখুন।

নজদের মাটিতে ৭০ জন সাহাবা হত্যা

মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) কাফেরদের যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের নির্দেশে মক্কা ভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মদীনায় উপস্থিত হয়ে তিনি শুধু আত্ম রক্ষা করেন নি বরং মদীনায় তিনি প্রকাশ্য ভাবে পবিত্র ইসলাম প্রচার করেন ও তার ইসলাম প্রচারে যে, কয়টি পদ্ধতি উল্লেখ যোগ্য ছিল তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতি হল বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথমটি হল কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা। যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হত তারা বিনা শক্তি প্রয়োগেই ইসলামের আদর্শ উপলব্ধি করতঃ পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন।

মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) এর ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ছিল যে,তিনি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাহাবা কেরামদেরকে আরব প্রতিবেশী দেশে প্রেরণ করতেন। তাঁরা সেখানে পৌঁছে কোরআন ও হাদীসের অমীয় বানী দ্বারা নিজ বুদ্ধি হেকমতে জন সাধারনের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতেন এ দুই প্রক্রিয়ায় ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম প্রচারিত হত।

সুতরাং ৪ হিজরী সনের সফর মাসে ইসলাম প্রচারের জন্য হুজুরে পাক (দঃ) নজদের ভূমিতে ৭০ জন সাহাবা কেরামদেরকে প্রেরণ করে ছিলেন। কিন্তু নজদীগণ সে প্রেরিত ৭০ জন সাহাবাকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। নিম্নে সেই ঘটনাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বিরে মাউনায় ৭০ জন সাহাবীর হত্যার ঘটনা ঃ

"বিরে মাউনা" নজদের একটি প্রসিদ্ধ কূপের নাম। এই কারণেই সেখানকার স্থানীয় গ্রামের নাম "বিরে মাউন" হয়। এই বিরে মাউনাতে ৭০ জন সুশিক্ষিত মোবাল্লেগ সাহাবা কেরামগণকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

নজদের সকল অধিবাসী জন্মগত ভাবেই কাফের বা বেঈমান ছিল। তবে তাদের মধ্য হতে "বারা" নামক একজন নজদী মদীনায় উপস্থিত হয়ে হুজুর (দঃ) এর হাতে বায়াত গ্রহন করে। অতঃপর কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করে ইসলামী শিক্ষা গ্রহন করে। "আবুল বারাহ (রাঃ)" নিজ দেশে ফিরার পূর্বে হুজুরে পাক (দঃ) এর খেদমতে অনুরোধ জানান যে, হুজুর! নজদের অধিবাসীদের মধ্যে আমি একমাত্র মুসলমান। আপনি যদি আমার সঙ্গে কতিপয় মোবাল্লেগ সাহাবী পাঠান, তবে আমি আশাকরি নজদের অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে। হুজুর আকরাম (দঃ) বললেন, আমি নজদে কোন মোবাল্লেগ পাঠাতে পারি না। কারণ সকল নজদী গাদ্দার, কাফের ও মুনাফেক। সে দেশেরই এক বৃদ্ধ কাফের দারুন নদওয়াতে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। হযরত নবী করীম (দঃ) নজদবাসী সম্বন্ধে এতটুকু বলার পরও হযরত আবুল বারা (রাঃ) বারংবার একই কথা বলতে থাকে, হুজুর! আমি আশা করি আপনি সেখানে মুবাল্লেগ প্রেরন করে উপকৃত হবেন।

হযরত আবুল বারা (রাঃ) এর বারংবার অনুরোধের পর হযরত নবী করীম (দঃ) ৭০ জন সুশিক্ষিত সাহাবাকেরামকে "নজদে" প্রেরন করেন। আবুল বারা (রাঃ) এই ৭০ জনের নিরাপত্তা বিধানের চুক্তিবদ্ধ হন।

হুজুর পাক (দঃ) "মানযীর" বিন আমের (রাঃ) কে ৭০ জনের উপর আমীর নিয়োগ করলেন। হযরত মানযিরের হাতে হুজুর পাক (দঃ) এর হস্তলিখিত একখানা পত্র দেয়া হয়। হযরত আবুল বারা (রাঃ) এর পথ প্রদর্শনে ৭০ জন প্রখ্যাত শিক্ষিত সাহাবা কেরাম নজদের নেতা আবুত তোফায়েলের নিকট বীরে মাউনা গ্রামে উপস্থিত হন। আবুত তোফায়েল জিজ্ঞেস করল যে, তোমরা কারা? হযরত মানযির তখন মহানবীর হস্ত লিখিত পত্রখানা আবুত তোফায়েলের হাতে দিলেন। সেই মরদুদ পত্রখানা একটু না পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিড়ে ফেলে দিল। অতঃপর সেই মরদুদ

দরবারের পিছন দিকে তাকায়ে একজন কুর্দিকে নির্দেশ দিল পত্র বাহক মানযিরকে হত্যা করার জন্য। কুর্দি নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মানযিরকে নির্মমভাবে হত্যা করলো।

হযরত মানযির(রাঃ)কে হত্যা করার পর নজদী নেতা অবশিষ্ট সাহাবা কেরামগণকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। হযরত আবদুল বারা (রাঃ) এর স্ববংশগণ এই হত্যা কান্ডের প্রতিবাদ জানালে বলল, এই নিরপরাধ সাহাবাগণের দোষ কি? তাদেরকে আমাদের নজদবাসী আবদুল বারা নিরাপত্তা বিধান দিয়ে নজদে নিয়ে এসেছে।

নজদের নেতা আবুত তোফায়েল যখন দেখলো তার হত্যার নির্দেশ কার্য্যকরী হচ্ছে না, তখন আবদুল বারার বংশের লোকদের বাদ দিয়ে নজদের অধিবাসী চারটি আরব গোত্রকে সাহাবাগণকে হত্যার নির্দেশ দিল। নির্দেশকৃত চার গোত্রের নাম। ১। রয়েল। ২। যাকওয়ান। ৩। ওছাই ও ৪। বনীলেইহান।

উপর উল্লেখিত চার গোত্র বাহিনী অতর্কিত হামলা করে মোবাল্লাগ সাহাবাগণকে হত্যা করে। এই শহীদানদের লাশের স্তুপের মধ্যে হযরত কা'ব বিন যায়েদ আহত অবস্থায় মৃতের ভান করে পড়ে থাকেন। যখন হত্যাকারীগণ সাহাবাগণকে এক এক করে নির্ম্মভাবে হত্যা করার পর প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত হয়, তখন হযরত কা'ব বিন যায়েদ লাশের স্তুপ হতে উঠে অতি কষ্ট করে মদীনার পথে রওয়ানা দেন। তিনি কয়েক দিন পর্যন্ত মদীনার পথ অতিক্রম করার পর পথে দেখেন যে, একটি গাছের ছায়ায় দু'ব্যক্তি নিদ্রা যাপন করতেছে। হযরত কা'ব ঐ দু'জনকে নজদের অধিবাসী মনে করে নিদ্রা অবস্থায় হত্যা করেন এবং হযরত কা'ব (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত হয়ে বললেন, হুজুর! আমি দু'জন নজদীকে গাছের নীচে হত্যা করে ৭০ জন সাহাবা হত্যার বদলা নিয়েছি। হুজুর (দঃ) বললেন, তারা দু'জনতো নজদী নয়, বরং তারা আমার প্রতিশ্রুতিত ভিন্ন দেশী। তাই এই দু'জনের হত্যার খেসারত আমারই বহন করতে হবে।

অতঃপর হযরত নবী করীম (দঃ) হযরত কা'বকে লক্ষ্যকরে বললেন, হে কা'ব! নজদের মাটিতে কি নির্মম হত্যা চলতেছিল তা আমি জানি। নজদীগণ জন্মগতই বেদ্বীন। তবে আমি আবদুল বারা সাহাবীর অনুরোধে ৭০ জন প্রশিক্ষিত সাহাবাগণকে নজদে প্রেরন করে ছিলাম। হে সাহাবাকেরামগণ! এসো নজদীবাসীদের ধ্বংসের জন্য নামাজান্তে কুনুতে নাজেলা পাঠ করে বদদোয়া করি।

তারপর হতে হযরত নবী করীম (দঃ) নামাজান্তে রুকুর পর একমাস পর্যন্ত কুনুতে নাজেলা পাঠ করে গোঠা নজদের অধিবাসীর জন্য বদদোয়া করতে থাকেন। তবে এই কুনুতে নাজেলা পাঠ করা পরবর্তিতে রহিত হয়ে যায়।

পাঠক ঃ বদদোয়া, কাউকে অভিশাপ দেয়া নবী করীম (দঃ) এর শানের বরখেলাপ ছিল। জীবনে তিনি কারো জন্য বদদোয়া করেন নি। উহুদের ময়দানে তাঁর নুরানী শরীরের উপর কত বড় আঘাত এসেছে, দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছে, তারপরও তিনি মুখে উচ্চারণ করেন اللهم । اهد قومي । আল্লাহ তুমি আমার কাওমকে হেদায়েত কর। তবে তিনি নজদের মধ্যে ৭০ জন সাহাবা কেরাম শহীদ হওয়ার খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে নজদীদের জন্য বদদোয়া করেন। এমন কি নামাজান্তে কুনুতে নাজেলা পাঠ করতঃ নজদের অধিবাসীদের জন্য বদদোয়া করেন। (বোখারী কিতাবুল মাগাজী)

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল সেই নজদের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এর অনুসারী এবং হিন্দুস্থান দেওবন্দের আলেমদের নিকট সাহাবা হত্যা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। তারা তাদের রচনাবলীতে লেখেছেন কেউ কোন সাহাবাকে কাফের বললে সুন্নীয়ত বাতিল হয় না। নজদী আকীদা ভাল ছিল, শক্ত ছিল ও পাকা ছিল। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া)

নজদে "রেজেয়ীতে" সাহাবা হত্যা

(৫৭৫ পৃষ্ঠা (বোখারী শরীফ)

নজদের অর্ন্তভূক্ত "রেজেয়ী" নামক একটি বস্তি রয়েছে। সে বস্তিতে সাহাবা হত্যার যে হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে তা ইমাম বোখারী (রঃ) বোখারী শরীফের মধ্যে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে তা সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

ইসলামের প্রারম্ভে হযরত রাসূলে পাক (দঃ) মক্কা মদীনার প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য মোবাল্লেগ পাঠাতেন। একবার আট দশ জন মোবাল্লেগের উপর হযরত আছেম (রাঃ) কে প্রতিনিধি করে নজদের অজ্ঞাত রেজেয়ী নামক স্থানে প্রেরন করেন, জাকওয়ানবাসীগণ সাহাবাগণের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নেয়। সাহাবাগন নজদী কাফেরগণের প্রস্তুতি দেখে একটি পাহাড়ের মধ্যে আত্ম গোপন করেন। নজদীগণ সাহাবাগণকে হত্যা করবে না বলে আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে অবতরনের আহবান করলো। হযরত আছেম (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমরা কাফেরের নিরাপত্তার বিশ্বাসী নই। নজদীগণ এই উত্তর পেয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে পাহাড়ের উপর তীর বর্ষণ করতে থাকে। হযরত আছেম (রাঃ) তীরের আঘাতে শহীদ হয়ে গেলেন। শাহাদাত বরন কালে হযরত আছেম দোয়া করতে থাকেন হে আল্লাহ! আমাদের এই মর্মান্তিক অবস্থার সংবাদ টুকু আমাদের রাসুলের নিকট পৌঁছে দাও। তাঁর শাহাদাত লাভের পর তাঁর সাথী হযরত যায়েদ, খোবাইব ও আবদুল্লাহ বিন তারেক রাঃ) কে নজদীগণ নিরাপত্তা বিধান দিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নামালো এবং অতর্কিত আক্রমন করে সাহাবাগণের হাতিয়ার ছিনাইয়া নিলো। অতঃপর তাঁদেরকে পিছন দিক থেকে বেঁধে ফেলল। এবং সকলকে "রেজেয়ীর" বস্তিতে নেয়ার জন্য টানাটানি করলে আবদুল্লাহ বিন তারেক যেতে রাজী না হওয়াতে তাঁকে সে পাহাড়ের নীচেই শহীদ করেদিল। হযরত যায়েদ ও খোবাইব (রাঃ) কে বেঁধে প্রথমতঃ রেজেয়ীর বস্তিতে নিয়ে গেল। সেখানে এই দু'জনকেও বহু কষ্ট দিয়ে পরিশেষে মক্কার বাজারে নিয়ে গেল। হযরত খোবাইবকে হারেছ বিন নওফেলের সন্তানদের নিকট বিক্রি করে দিল। হারেছের সন্তানগণ খোবাইবকে বাড়ীতে নিয়ে কোপায়ে কোপায়ে শূলিতে আরোহন করাল। কারণ হযরত খোবায়েব হারেছকে বদর যুদ্ধের মধ্যে নিহত করেছিল। হুজুর আকরাম (দঃ) এই নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে হযরত আমর বিন উমাইয়া জমীরী (রাঃ) কে খোবাইবের লাশ উদ্ধার করার জন্য মক্কায় প্রেরন করেন। হযরত খোবাইব (রাঃ) কে তিনি যখন উদ্ধার করেন তখন কাফেরগণ মদ পানে নিমগ্ন ছিল। হযরত আমর (রাঃ) খোবাইবের লাশ কাঁধে করে মদীনার পথে রওয়ানা দিলে তার কিছুক্ষণ বাদ কাফেরগণ এ রহস্যটি জানতে পারলো তখনই পিছন থেকে ধাওয়া করে। হযরত আমর (রাঃ) কোন উপায় না দেখে লাশকে মাটিতে ফেলে দেন। সাথে সাথে মাটি খোবাইবের লাশকে গ্রাস করে নেয়। কাফেরগণ বহু তালাশ করে খোবাইবের লাশ পেল না। অতঃপর তারা নিজ বাস স্থানের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

উপরে উল্লেখিত ঘটনাটি বিরে মাঊনার ঘটনা সংগঠিত হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বেই ঘটে ছিল।

মসজিদ নয় ধর্ম নাশের যাঁতাকল

ইসলামের শুরুতেই ইসলামের শত্রুগণ হযরত মহানবী (দঃ) এর সাথে বহু যুদ্ধ করে ও তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। হুজুর পাক (দঃ) কে হত্যা করতে গিয়ে স্বয়ং তারাই হত্যা হয়েছে। যেমন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর ময়দানে অন্ততঃ ২৪ জন আরব বিখ্যাত নেতা প্রাণ হারায়।

এ কারনেই হুজুরে পুর নূর (দঃ) হিজরত করে মদীনায় বসতি স্থাপন করার পরও কুফ্ফারে কুরাইশগণ ইসলামের শত্রুতায় নবীর শত্রুতায় মেতে উঠে। তারা মদীনার মুনাফেকদের সাথে এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, যখন নবী (দঃ) মক্কা ত্যাগকরে মদীনায় বসতি স্থাপন করেছেন তোমাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল তোমরা তাঁকে মদীনাতেই হত্যা করবে। মদীনার মুনাফেকগণ কুরাইশদের বন্ধুত্বের খাতিরে হুজুরে পাক (দঃ) কে হত্যা করার বহু পরিকল্পনা অংকন করে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মুনাফেকদের একটি পরিকল্পনা ছিল যে, ইবাদত উপাসনার নামে তারা জেরার নামে একটি মসজিদ নির্মান করে এবং তথায় নবীকে উদ্বোধনী দাওয়াত দেয় তাদের লক্ষ্য ছিল তিনি যখন মসজিদে উপস্থিত হবেন, ঠিক তখন তারা সংঘবদ্ধ আক্রমন চালিয়ে তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু মহানবী (দঃ) মক্কায় যেরূপ কাফের হতে সতর্ক ছিলেন, তদ্রূপ মদীনাতেও মুনাফেক হতে অধিক শতর্ক ছিলেন। এই সতর্কের মূল মন্ত্র ছিল আল্লাহ পাক মুনাফেকদের তথাকথিত মসজিদ খানাকে অনিষ্টকারী মসজিদ নামে অভিহিত করেন। যেমন বলেন ঃ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ۔

মুনাফিকরা হল এরূপ ব্যক্তি যারা মসজিদ নির্মান করেছে। যা হল অনিষ্টকারী ও কুফরীতে ভরপুর। অর্থাৎ মুনাফেকদের উদ্দেশ্য হল তারা তথায় আপনাকে হত্যা করে কুফরীতে লিপ্ত হবে। (আপনি শতর্ক হউন)

মসজিদে যেরার অনিষ্টকারী মসজিদ হল কিরূপে তা আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে ব্যাখ্যা করেন নি। তবে হাদীস শরীফের মধ্যে উহার বিস্তারিত আলোচনা বর্ণিত আছে। আমি সেই আলোচনাটি এখানে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

"জান্দস" নামক একজন প্রসিদ্ধ মুনাফিকের নির্দেশে মসজিদে কোবার পাশা পাশি একটি মসজিদ নির্মান করা হয়। এতে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য ছিল যে, হুজুরে পাক (দঃ) যখনই সে মসজিদখানাকে উদ্বোধন করতে আসবেন, তখনই তাঁর চতুর্দিক ঘেরাও করে তাঁকে সেখানে হত্যা করে ফেলবে।

এতদ উদ্দেশ্যকে মোনাফিকগণ অন্তরে গোপন করে রেখে তারা কয়েক মাস যাবত অতি পরিশ্রম করে তথাকথিত মসজিদ খানা নির্মান করে। নির্মান কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তারা হুজুর (দঃ)-কে উদ্বোধন করার দাওয়াত দিল। আর বলল যে, হুজুর! ইবাদত ও উপাসনার খাতিরে আমরা 'কোবার' ন্যায় আর একটি মসজিদ তৈরী করছি। আপনি সেখানে পদার্পন করতঃ বরকতের জন্য দোয়ায়ে খায়ের করুন। উদ্বোধনী দাওয়াত কালে রাসূলে পাক (দঃ) তাবুকের যুদ্ধ পথে রওয়ানা দিচ্ছিলেন তাই তিনি মুনাফিকদেরকে উত্তর দিলেন যে, আমি তোমাদের দাওয়াত সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করব এখন তোমরা যদি খাটি মুসলমান হও তবে আমার সঙ্গে তাবুকের পথে রওয়ানা হও। তখন মুনাফিকেরা ওজর আপত্তি জানাতে থাকে। কেহ বলে হুজুর আমার কয়দিন হতে জ্বর। কেহ বলে আমার পরিবার অসুস্থ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ আরো অনেক ওজর আপত্তি পেশ করে তারা নবীর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যাওয়া হতে বিরত থাকলো।

হুজুরে পাক (দঃ) তাঁর ধর্মপ্রাণ সঙ্গী সাহাবাগণকে সঙ্গে করে তাবুকের পথে রওয়ানা দিলেন। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর তিনি আবার মদীনার পথে রওয়ানা দিলেন। চলতে চলতে তিনি যখন তাবুক ও মদীনার মধ্যস্থানে (আকাবায়) উপস্থিত হন, তখন দাওয়াত দাতা মুনাফিকগণ সে আকাবায় ঘাটিতে উপস্থিত হয়ে হুজুর পাক (দঃ)-কে প্রাণে বধ করার ষড়যন্ত্র করে। হুজুর জানতেন যে, মুনাফিকগণ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। তাই

তিনি সাহাবাগণকে বললেন যে, আমি যখন আকাবা ঘাটির নিকটে পেঁছবো তখন তোমরা সে ঘাটির দু'ধারের বস্তিতে পথ আগাতে থাকবে। আমি একাই আকাবার 'মধ্য' পথ দিয়ে অতিক্রম করবো। সাহাবাগণ হুজুর পাক (দঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক বস্তির দু'ধারের পথে মদীনার দিকে এগিয়ে চললেন ও ইমার বিন্ ইয়াসেরকে বললেন তুমি আমার উটের লাগাম ধরে সামনের দিকে পথ নির্দেশ কর। হযরত হুজায়ফা বিন ইয়ামন (রাঃ) কে বললেন, তুমি আমার উটের পিছে পিছে থেকো। হুজুরে পাক (দঃ) এ নিয়মে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। যখন 'আকাবা' ঘাটির মুখে উপস্থিত হতে থাকেন, তখন তিনি পিছের দিক হতে শত্রুর উটের পায়ের শব্দ ও অস্ত্রের ঝনঝনানী শুনলেন। হযরত হুজায়ফা শত্রু অক্রমন দেখে চিৎকার দিতে থাকেন, হে শত্রুর দল! নবীর পথ রুদ্ধ করোনা এর ফলাফল ভাল হবে না। হুজায়ফা (রাঃ)এর চিৎকার শুনে বস্তি পথে চলমান সাহাবাগণ যখন হুজুরের দিকে এগিয়ে আসলেন তখন মুনাফিকের দল পার্শ্ববর্তী বস্তিতে পলায়ন করে। অতঃপর মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) নিরাপদে পথ অতিক্রম করে মদীনায় উপস্থিত হন। পথিমধ্যেই উপরে বর্ণিত আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ যে আয়াতের মধ্যে মুনাফিক নির্মিত মসজিদখানা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ আছে। অতঃপর হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় উপস্থিত হয়ে তথাকথিত মসজিদে যিরারকে সাহাবাদের সাহায্যে স্বহস্তে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।

পাঠক ঃ যে মসজিদের মূলভিত্তি স্থাপন ধর্ম ধ্বংসের জন্য হয় সে মসজিদ যত বড় বা ছোট হোক না কেন উহাকে ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ। সে হিসেবে কাকরাইলের মসজিদ খানা সম্পর্কে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ ইসলামের পাচ বেনার পরিপন্থী তাবলীগী ছয় উছুল প্রচারের জন্য উক্ত কাকরাইলের মসজিদ নামে আবাসিক হোটেলটি আজও নির্ধারিত। মসজিদে মেহরাব থাকে তবে কাকরাইলে তা নেই। কাকরাইলের মসজিদটি মসজিদ নয়, বরং থাকা খাওয়ার উন্নত মানের আবাসিক হোটেল মাত্র।

হুজুরে পাক (দঃ) তথাকথিত মসজিদে যিরারটিকে স্বমূলে ভেঙ্গে ফেলে সে স্থানে মসজিদে "ফাতেমা" নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। আজ সেই মসজিদ খানা নজদীদের হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত। এ ধ্বংসের মূল কারণ এও হতে পারে যে, নজদীগণ কাফের ও মুনাফিক পন্থী ছিল। হযরত নবী করীম (দঃ) মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদ যখন ধ্বংস করেছেন তাই তারা প্রতিশোধ স্বরূপ মসজিদে ফাতেমাকে ভেঙ্গে দেয়। এ ছাড়া নজদীগণ উহুদ ময়দানে নির্মিত মসজিদে "সানায়া" কেও ভেঙ্গে নির্মূল করেছে। মসজিদে "মায়েদা" ও মসজিদে "ইজাবা" এর বর্তমান অনুরূপ অবস্থা।

কতিপয় সহীহ হাদীসের মাধ্যমে নজদী পরিচয়

কা'বার সোজা পূর্ব দিকের একটি মরুময় ঘৃণিত অঞ্চলকে "নজদ" বলে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীরা আল্লাহ পাকের গজব প্রাপ্ত এবং মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর অভিশপ্ত। মক্কা বিজয়ের পর হযরত নবী করীম (দঃ) নজদকে আরবের অন্যান্য দেশ হতে পৃথক করে ঘৃণিত অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি খানায়ে কাবার সঙ্গে সম্পর্ক করে বলেন–রোকনে ইয়ামনী, রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকী। কিন্তু এখানে রোকনে নজদী বলে হুজুরে পাক (দঃ) কা'বা শরীফের দিক চিহ্নিত করেন নি। কারণ নজদীগণ প্রকৃত "কা'বা" পন্থী ছিলনা।

মহানবী (দঃ) এর ইসলাম প্রচার কালে কা'বা শরীফের চতুর্দিকের কাফেররা ইসলামী আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। আর মক্কা হতে দূর দূরান্তের অবস্থানরত অধিবাসীরা ইসলাম প্রবর্তক মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর চরিত্র ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে কালাম পাক-এর মহাবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা "ওফদ" বা ইসলামী দল নাম ধারণ করতঃ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়। সে সময় তাদের কারো কারো মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল "ইয়া নবী আল্লাহ" আর কারো মুখে উচ্চারিত হতো আজানের বাক্যাবলীঃ আল্লাহু আকবার। তাঁরা দূরদূরান্ত হতে কা'বা শরীফের আঙ্গিনাতে উপস্থিত হয়ে হুজুরে পাক (দঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহন করতঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এমন কি "নসিবাইনের" জ্বীন জাতি পর্যন্ত হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। কিন্তু কমবখত কোন নজদী হুজুরে পাক (দঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঈমান লাভ করে নাই। বরং নজদীগণ ঈমান লাভের পরিবর্তে ঈমানদারগণকে নির্মমভাবে হত্যা করতো। এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ নজদের বীরে-মাউনাতে ৭০ জন ঈমানদার মোবাল্লিগ হাফেজে কোরআন সাহাবাকে হত্যা করা ও "রজি" -এর ঘটনাতে হযরত খোবাইব (রাঃ) কে শূলিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা। এই দু'টি ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা বোখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে। ইনশাআল্লাহ আমি ইতিপূর্বে এ দু'টি ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

প্রকৃত পক্ষে নজদীগণ ছিল জন্মগত নাফরমান নাস্তিক ও কাফের। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) নজদ ও নজদীবাসীদের সম্বন্ধে কি কি অভিমত পোষণ করেন সে ব্যাপারে সহীহ সনদ সূত্রে কয়েকটি হাদীস নিম্নে বর্ণিত হল।

(١) عن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر من ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان
(بخارى ، مسلم)

(১) হাদীসঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) বলেছেন, মূল কুফর বা প্রধান কাফের পূর্ব দিকে। অর্থাৎ মক্কার পূর্ব দিকে আরব ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ঘৃণিত প্রদেশ "নজদ" অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানেই কাফেরদের মূল ঘাটি অবস্থিত। অথবা ঐ এলাকাতে যারা বসবাস করছে তারাই প্রকৃত কাফের। কারন, তথাকারই তথাকথিত শেখ নজদী প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার জন্য আবু জেহেলকে কুপরামর্শ দিয়েছিল। তাই প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) যখনই পূর্বমুখী হতেন, তখনই তিনি পূর্ব দিককে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করে বদদোয়া করতেন।

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এই হাদীসটির দ্বিতীয় অংশে বলেন, ঐই নজদ হতে শয়তানের ধারাল শিং এর আবির্ভাব হবে। দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে "করনুশ শয়তান" বা শয়তানের প্রথম শিং মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার মুসায়লামা কাজ্জাব এবং দ্বিতীয় শিং দ্বারা মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ)-এর এই ভবিষ্যতবানীটি ১৪শত বছরের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব রূপ ধারন করেছে। প্রথম শিং-কে দমন করা হয় হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে। আধুনিক কালের শয়তানের শিং অর্থাৎ ১৮০১ইং ওহাবীরা সাউদ বিন আবদুল আজিজের নেতৃত্বে কারবালার পবিত্র ভূমি হতে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর পবিত্র মাজার ভেঙ্গে দেয়। ১৮০৩ইং সালে মক্কা আক্রমন করে কা'বা শরীফের গিলাপ ছিঁড়ে ফেলে। আম্বিয়া, আওলিয়া, সাহাবা কেরামদের কবর ও মাজার সমূহ ভেঙ্গে ফেলে। ১৮০৪ইং মদীনা শরীফ আক্রমন করে। এই পবিত্র স্থানটি ১৮১৩ইং পর্যন্ত ওহাবীদের দখলে ছিল। তাদের অধীনে থাকা অবস্থায় তারা জান্নাতুল বাকীর সকল মাজার সমূহ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। এমনকি হুজুরে পাক (দঃ) এর রওজা পাকের উপরও ঘৃণিত ঝাণ্ডা

থাবা বিস্তার করেছিল। ওহাবীরা যে কুফরী কর্মে লিপ্ত হয়েছিল তা পবিত্র কোরআনে ঘোষিত কাফেরগণও এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয় নি। বড় পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের এতদ্দেশীয় দেওবন্দীগণও আবদুল ওহাব নজদীকে সংস্কারক বলে আখ্যায়িত করে আসছে। তারা তার প্রশংসা করে থাকে এবং তারই অভিমত সমূহকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়ে তার কুফরী ক্রিয়া কর্মের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এমন কি বর্তমানেও অনুরূপ আকিদা পোষণ করে চলছে। তাদেরই একটি শাখা হলো বর্তমান ইলিয়াসী তাবলীগী সম্প্রদায়। তাই সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইদেরকে তাদের অপকর্ম হতে দূরে সরে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

নজদী পন্থীদের তায়েফ আক্রমন

তায়েফ আক্রমণের কুকর্ম ওহাবী ফের্কা পন্থীদের অন্যতম কুকীর্তি। তারা এ পবিত্র স্থানটি করতলগত করে সেখানকার ঈমানদার অধিবাসীগণকে নির্মম ভাবে হত্যা করতে থাকে। তাদের জুলুম সীমা অতিক্রম করেছিল। তারা মায়ের সামনে শিশুকে হত্যা করেছে। একদিনের ঘটনা : এক স্থানে কতিপয় লোক কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন ওহাবীরা তাদেরকে সেখানে হত্যা করে। অনেক মসজিদের মুসল্লিগণকে নামাজে রত থাকা অবস্থায় হত্যা করে। এই ভাবে তারা একদিনে ২৭০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। ওহাবীরা তায়েফের বস্তি সমূহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। শুধু, তাই না এ ছাড়া ওহাবীদের আরো অনেক কুকীর্তি রয়েছে। ১২১৭ হিজরীতে এসব কুকর্ম সংগঠিত হয়। (নজদ ও হেজাজ ১৬২ পৃঃ)

(٢) عن ابن عمر (رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وهو مستقبل المشرق ان الفتنة ها هنا (بخاری - مسلم)

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হুজুর আকরাম (দঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, একদা প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) পূর্ব মুখী হয়ে অর্থাৎ নজদের দিকে ফিরে বলেছেন, এ দিক হতে ফেতনা ফাসাদ আবির্ভূত হবে। এ পূর্ব দিক উল্লেখ করে হুজুরে পাক (দঃ) নজদকেই উদ্দেশ্য করেছেন, বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম)

(٣) قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل -

○ وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء بالمشرق والايمان في اهل الحجاز -

হযরত নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেন, মূল কুফর পূর্ব দিকে এবং গর্ব ও অহংকার রাখালদের মধ্যে।

অন্য আর এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, কঠিন অন্তর ও জুলুম অত্যাচার পূর্ব দিকের লোকদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবে। আর "ঈমান" হেজাজ এর বাসিন্দাদের মধ্যে থাকবে।

প্রিয় পাঠক। উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা নজদ ও নজদ বাসীদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝানো হয়েছে। কারণ গর্ব ও অহংকার এবং জুলুম ও অত্যাচার তাদের দ্বারা যেমন প্রকাশ পেয়েছে এরূপ আর কোন এলাকার লোকদের দ্বারা তা প্রকাশিত হয় নি।

(٤) قال النبي (ص) يخرج ناس من المشرق يقرؤن القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق -

হযরত নবী করীম (দঃ) ফরমান-পূর্ব দিক হতে (অর্থাৎ নজদ দেশ হতে) একদল লোক বের হবে, তারা ঠিকই কোরআন পাঠ করবে, কিন্তু

কোরআনের মর্মার্থ তাদের কণ্ঠনালীর নীচে অতিক্রম করবে না। অর্থাৎ কোরআনের অর্থ বুঝবেনা। তারা ইসলাম ধর্ম হতে এমনি ভাবে দূরে সরে পড়বে যেমন তীর ধনুক হতে ছুড়লে আবার ফিরে আসে না। এসব লোকের সাধারণ লক্ষণ হল তাদের মাথা মুড়ানো থাকবে। ঠিক এই লক্ষণটি পরিলক্ষিত হয়েছে নজদবাসী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীদের মধ্যে।

নোট ঃ আমাদের এতদ্দেশেও তথাকথিত একদল মোবাল্লেগ জনসাধারণের মধ্যে খ্যাতি অর্জনের জন্য মাথা মুড়ায়ে ফেলে। তারা দাবী করে যে, তারাই প্রকৃত ইসলামের অনুসারী। প্রকৃত পক্ষে তারা হল ইসলামের পরম শত্রু। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু। তাই তাদের থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক ঈমানদারের একান্ত কর্তব্য।

(٥) عن ابن عمر (رض) مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وفي مدينتنا ثم استقبل مطلع الشمس فقال ها هنا يطلع قرن الشيطان ومن ها هنا الزلزال والفتن ·

একদা হযরত নবী করীম (দঃ) আরবের শাম, ইয়ামন ইত্যাদি দেশের জন্য দোয়া করার পর মদীনার মাপ তৌলের যন্ত্রাদির জন্যও দোয়ায়ে বরকত করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব মুখী হয়ে নজদের জন্য বদদোয়া করেন, আর বলেন এ দিক হতে শয়তানের শিং উদয় হবে। অর্থাৎ শরীয়ত বিগর্হিত কার্য কলাপ এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদকারী ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি ও ভূমিকম্প শুরু হবে। (বোখারী)

প্রিয় পাঠক ঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা নজদের অধিবাসী মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের ওহাবী আন্দোলনের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারন তারা সংস্কারের নামে ইসলামের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করছে।

(٦) عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان (بخاري)

অপর একখানা হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (দঃ) শাম ও ইয়ামনের বরকতের জন্য দোয়া করলে সাহাবাদের মধ্য হতে কেহ কেহ আরজ করল। "ইয়া রাসূলাল্লাহ"। আমাদের নজদ সম্পর্কে দোয়া করুন। তখন হুজুর (দঃ) পূর্ববৎ আবারও শাম ও ইয়ামনের জন্য দোয়া করলেন। বর্ণনাকারী বলেন আমার ধারনা মতে হুজুরে পাক (দঃ) তৃতীয়বারে বললেন, ঐ নজদ হতেই ভূ-কম্পন এবং বিভিন্ন ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে। এবং তথা হতেই শয়তানের শিং প্রকাশ পাবে। (অর্থাৎ সর্ব প্রকার শয়তানী অভিমত প্রকাশ পাবে যা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী কর্তৃক প্রকাশ লাভ করেছে)। (বোখারী)

প্রিয় নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-সম্পর্কে ওহাবী আন্দোলনের স্রোত।

আবদুল ওহাব নজদীর কতিপয় কুকীর্তি

১। শেখ নজদী নবী করীম (দঃ)-কে সংবাদ দাতা ডাকপিয়ন বলেছে। ধর্মের কুৎসা করে, আরো সে বলেছে :

২। হোদাইবিয়ার সন্ধি একেবারে মিথ্যা ও বানোয়াট।

৩। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ইহকালে ও পরকালে কারো কোন উপকারে আসবে না।

৪। চারি মাযহাবের চার ইমাম ভ্রান্ত ও মিথ্যা।

৫। শেখ নজদী দরূদ শরীফ বিরোধী ছিল। কারণ তার মতে দরূদ শরীফের কোন প্রয়োজন নেই।

৬। আজানের বাক্যে আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ উচ্চারণকারী জনৈক মোয়াজ্জিনকে সে হত্যা করেছে।

৭। দালায়েল খায়রাত ও দরূদের কিতাব সমূহকে অগ্নিদগ্ধ করেছে।

৮। ফেকাহ, তাফসীর ও হাদীসের গ্রন্থসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

৯। কোরআনের তরজমা ইচ্ছামত করেছে।

১০। সে কাফের মুশরিক ও মুনাফেকগণকে খাটি ঈমানদার বলে আকীদা পোষণ করতো। এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ তার রচিত কাশফুশ শুবহাত ও কিতাবুত তাওহীদ দুটি পুস্তক।

১১। সে যে কোন সুন্নী আলেমকে হত্যা করা জায়েজ আকীদা পোষণ করতো।

১২। ঈমানদার মুসলমানদের মালামাল লুণ্ঠন করতঃ ডাকাতের নিয়মে ওহাবীদের মধ্যে তা বন্টন করতো।

১৩। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী প্রকৃতপক্ষে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলনা। তবে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নিজেকে হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী বলতো।

১৪। শেখ নজদী বাদ নামাজ দোয়া করা হারাম আকীদা পোষণ করতো। আর বলতো-নামাজের পর দোয়া করে আল্লাহ হতে মজুরী চাওয়ারই সামীল।

নোট ঃ প্রিয় পাঠক বৃন্দ! আমাদের দেশের বর্তমান দেওবন্দী ও খারেজীগণ অধিকাংশ উপরোক্ত আকীদার অনুসারী। কতিপয় ওহাবী আজও মিলাদকে হারাম বলে এবং আজানের বাক্যের মধ্যে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্য শ্রবণ পর চক্ষু চুম্বন নীতিকে নাজায়েজ বলে।

ফতোয়ায়ে শামীতে ওহাবী আন্দোলনের সঠিক দিক দর্শণ।

(রদ্দুল মুহতার ৪২৭—২৮ পৃষ্ঠা)

كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين
خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون
مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون
وان من خالف اعتقادهم مشركون - واستباحوا بذلك
قتل اهل السنة وقتل علمائهم ·

ইসলামের সু-প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব শামী কিতাবের লেখক

আল্লামা শামী (রাঃ) মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর আকীদা বিশ্বাস সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত ওহাবীদের আকিদা বিশ্বাস খারেজী আকিদা বিশ্বাসের অবিকল অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তারা হযরত আলী (রাঃ) ও মাবিয়ার মধ্যে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ চলাকালে হযরত আলী (রাঃ) এর মতাদর্শের একেবারে বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত খারেজী ফের্কা হযরত আলী ও মাবিয়া (রাঃ) উভয়কে কাফের বলে অভিহিত করেছে। যেমন আজ কাল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী ফের্কা দুনিয়ার সকল মানুষকে কাফের নামে আখ্যায়িত করতেছে। এরা আরব ভূখন্ডের নজদ হতে আত্ম প্রকাশ করে। (প্রথমে তারা ১৮০১ ইংরেজী সনে কারবালা ও মক্কা শরীফ আক্রমণ করে। এবং কাবা ঘরের গিলাফ ছিঁড়ে ফেলে। অতঃপর ১৮০৪ ইং সনে মদীনা শরীফ আক্রমণ করে সেখানকার মাজারসমূহ ধ্বংস করে ফেলে।)

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলনা। তথাপিও সে মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য নিজেকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলতো। তার ভ্রান্ত আকীদার মধ্যে একটি আকীদা এই ছিল যে, তার বিশ্বাসীরাই শুধু মুসলমান, যারা তার বিরোধিতা করবে তারা কাফের ও মুশরেক। তার এই নীতিমালা অনুসারে সে ওলামায়ে আহলে সুন্নতকে হত্যা করা জায়েয আকীদা পোষণ করতো।

তাফসীরে সাবীর ভাষ্যে ওহাবী ফের্কা

(৩য় খণ্ড ২৫৫ পৃঃ)

قوله تعالى : افمن زين له سوء عمله " هذه الاية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تاويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المؤمنين واموالهم كما هو مشاهد الآن في نظائرهم وهم فرقة في ارض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون -

উল্লেখিত আয়াতটির ব্যাখ্যায় সুবিখ্যাত তাফসীরে সাবীর গ্রন্থকার বলেন "প্রত্যেকের কু-কর্মই নিজের জন্য সুন্দর" এ আয়াতটিতে খারেজী ফের্কার কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ফের্কার সাধারণ পরিচিতি হল এই যে, তারা কোরআনের বিকৃত অর্থ করে এবং কোরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। যদ্বারা মুমেন মুসলমানদের জান মাল নষ্ট করা তারা বৈধ মনে করে। বর্তমানে যার জ্বলন্ত প্রমাণ নিদর্শন হয়ে আছে। তাদের পরিচিতি এই যে, উহারা হিজাজ ভূমির একটি ফের্কা, যাদেরকে ওহাবী বলা হয়। ওহাবীরা নিজেদেরকে বড় ধন্য মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তারা বড় মিথ্যাবাদী। তাদের উপর শয়তান সওয়ার হয়ে রয়েছে। তাই তারা আল্লাহকে ভুলে বসেছে। ওহাবীরা শয়তানের দল। হে মুমেনগণ ! তোমরা শয়তানের দল হতে সতর্ক থেকো। তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নোট ঃ "সাবী" ও শামীর মন্তব্য প্রায় একই সমান। আমরা ওহাবী ফের্কা সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশ করতে চাইনা, তবে উপরে উল্লেখিত কিতাব দু'টিতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস।

দেওবন্দী ফতোয়ায় ওহাবী পরিচয়

ফতোয়ায়ে শামীর ও তাফসীরে সাবীর বর্ণনা মতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ওহাবী আকীদা বিশ্বাস ছিল গান্দা নাপাক। তবে কতিপয়

দেওবন্দে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আলেমগণের নিম্ন ফতোয়াসমূহ ফতোয়ায়ে শামীর একেবারেই বিপরীত। যেমন ধরুন :

১। ওহাবী পন্থী হেকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী সাহেব উর্দু বাক্যে বলেন : نجدیوں کے عقائد پختہ تھے নজদীদের আকীদা বিশ্বাস বড় পাকা পোক্ত ও মজবুত ছিল। نجدی عقائد اچھے تھے। নজদী আকীদা বিশ্বাস বড় ভাল ছিল।

২। দেওবন্দ মাদ্রাসার বড় মুরুব্বী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব উর্দু বাক্যে বলেন : نجدی متبع سنت و دیندار کو کہتے ہیں নজদীগণ নবীকি রাসুলে করীম (দঃ) এর সুন্নতের অনুসারী ছিল এবং তারা বড় দ্বীনদার ছিল-নাউজুবিল্লাহ। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া দেখুন)

গঙ্গুহী সাহেব ফতোয়ায়ে রশিদিয়াতে উৎফুল্ল ও গৌরব সহকারে আরো বলেন : **নজদীগণকে ওহাবী বলা হয়।** তাদের আকীদা বিশ্বাস অত্যান্ত ভাল ছিল। (আসতাগফিরুল্লাহ)

৩। **সকল দেওবন্দীর অভিমত :** প্রত্যেক দেওবন্দী এক বাক্যে নিম্ন অভিমত পোষণ করে : যদি কেউ কাউকে ওহাবী বলে তাতে কোন খারাপ অর্থ বুঝাবেনা। কারণ ওহাবী আকীদা ও নজদী আকীদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আদিকাল থেকে নজদীগণের আকীদা পাকাপোক্ত। মাযহাবের দিক দিয়ে তারা হানাফী। (আল-মুহান্নাদ)

৪। আশরাফ আলী থানভীর ওহাবী বানানোর মারাত্মক প্রচেষ্টা। তিনি 'ইফাযা' নামক পুস্তকের ৩য় খন্ডে ৭১ পৃষ্ঠার ৮ম লাইনে লেখেন :

میں یوں کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس دس ہزار روپیہ ہو سب کی تنخواہ کردوں پھر خود ہی سب وہابی بن جائیں۔

থানভী সাহেব বলেন : ওহাবী মাযহাব আমার মনোপুত মাযহাব। আমি আশরাফ আলী বলছি যে, সেই মাযহাবের প্রচার ক্ষেত্রে যদি আমার দশ হাজার টাকা খরচ হয় তাতে আমার অসম্মতি নেই। আমার উদ্দেশ্য হল হিন্দুস্থানের সকলেই যেন ওহাবী পন্থী হয়ে যায়। এ উর্দু বাক্যে থানভী সাহেব ওহাবী মাযহাবকে কড়া সমর্থন দিয়েছেন।

নোট : পাঠকবৃন্দ ওহাবীদের ভাল মন্দ আকীদা নিয়ে আমরা বিতর্কে উপনীত হতে চাই না। তবে কতিপয় দেওবন্দী ও অন্যান্য ঈমানদার ওলামায়ে কেরামগণ তাদের সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন আমাদের বক্তব্য ঠিক তাই।

দেওবন্দী ফাতোয়ার জবাবে
ওলামায়ে হারামাইন

ওহাবী ফের্কার সমর্থনে দেওবন্দীগণ একটি কিতাব রচনা করেন যার নাম রাখা হয় তাকবিয়াতুল ঈমান। এই কিতাবখানা রচিত হওয়ার পর তাঁরা মক্কা মদীনার ওলামায়ে কেরামদের খেদমতে পেশ করেন তাঁদের থেকে কিতাব খানার সমর্থন আদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মক্কা-মদীনার ওলামায়ে কেরামগণ তাকবিয়াতুল ঈমান অর্থাৎ ওহাবী নীতিমালা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা একটি কুফরী ও ধর্মনাশা কিতাব। যেমন বলেন :

لا شك في بطلان منقول من تقوية الايمان بكونه موافقا للنجدية مأخوذا من كتاب التوحيد للقرن

الشيطان وقولك هذا الكتاب دجال كذاب استحق اللعنة من الله تعالى ولا تكتبه واولو العلم وسائر العالمين .

ইসমাইল দেহলভী যে তাকবিয়াতুল ঈমান নামক তথা কথিত পুস্তক রচনা করেছেন উহা নিসন্দেহে নজদী আকীদা মোতাবেক লেখা হয়েছে এবং ইহা শয়তানের শিং (মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের রচিত) কিতাব এরই অবিকল ফটো। এ কিতাবখানার রচয়িতা দাজ্জাল ও কাযযাব অর্থাৎ ফেৎনা সৃষ্টিকারী ও মিথ্যাবাদী লানতের উপযোগী ছিল ইত্যাদি।

ওহাবী ফের্কার বিরুদ্ধে ওলামায়ে দেওবন্দ।

১। "শিহাব সাকেব" ৬৭ পৃষ্ঠায় জনাব হোসেন আহাম্মদ মদনী সাহেব (রঃ) বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর প্রশংসা সম্বলিত পুস্তকাবলী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ওহাবী ফের্কা একটি বিশেষ বাতিল ফের্কা। এ ফের্কার কোন সুনির্দিষ্ট মাযহাব ছিলনা। তারা মাযহাবহীন ধর্মহীন ও ধর্মচ্যুত ছিল। তাদের আকীদা বিশ্বাস ছিল বদ ও ফাসেদ। হোসেন আহাম্মদ মদনী সাহেব আরো বলেন যে, যারা এই ফের্কার অনুস্বরণ করবে তারা নিঃসন্দেহে ধর্মচ্যুত।

২। তৎকালে ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম জনাব আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী সাহেব ফয়জুলবারী কিতাবে ১৭১ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর সম্বন্ধে নিম্ন মন্তব্য করেন ঃ

اما محمد بن عبد الوهاب النجدى فكان رجلا بليدا قليل العلم فكان متسارع الى الحكم بالكفر (فيض البارى ص ١٧١ -

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী একজন লম্পট লোক ছিল। তার জ্ঞান বুদ্ধি ছিল অতি সামান্য, সে মুসলমানকে কাফের বলার মধ্যে ছিল তীক্ষ্ণ। ফয়জুলবারী পৃষ্ঠা নং ১৭১]

(নোট ঃ আল্লামা আনওয়ার শাহ দেওবন্দী (রহঃ) যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য। কারণ আমরা বৃটিশ গোয়েন্দা হামফ্রের ডায়রী খানাতে অনুরূপ মন্তব্য পেয়েছি। কারণ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব চরিত্রহীনা সুফিয়ার খাতা কলে আবদ্ধ হয়ে মুতা বিবাহ পালন করে, সে প্রসংগে তিনি সুফিয়ার হাতে পানি মিশ্রিত শরাবও পান করেছিল। এই শরাবী ব্যক্তি দেওবন্দীগণের নিকট দীনদার ধর্ম প্রাণ ছিল। (নাউজু বিল্লাহ)

দেওবন্দ মোনাজিরা বিভাগের প্রধান মুফতী মোরতাজা হোসাইনের ভাষ্যে ওহাবী ফের্কা

জনাব মুফতী মোরতাজা হোসেন দেওবন্দীকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, প্রত্যেক দেওবন্দী আলেমকে কেন কাফের, ধর্মচ্যুত বলা হয়? অথচ তাদের ধর্মীয় খেদমত প্রসিদ্ধ। তারা হিন্দুস্থানের মধ্যে বহু মাদ্রাসা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কোরআন ও হাদীসের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছে। ঐ ছাড়া তারা নামাজ রোজা পালনে বড় পাকা ছিলেন। তদোত্তরে তিনি বললেন ঃ

جو شخص نماز روزہ کی ادائیگی کے ساتھ تمام
اسلام کے لئے ہو رب تک پہنچے جائے اور دعوائے
ایمان کے ساتھ اہل ایمان کو گالیاں دیتا رہے اور ضرو
ریات دین کا انکار کرے اور اجماع امت کا مخالف ہو وہ

قطعاً یقیناً تمام مسلمانوں کے نزدیک کافر و مرتد ہے
(اشد العذاب)

যে ব্যক্তি ঠিকমত নামাজ রোজা পালন করার সাথে সাথে ইসলামী তাবলীগের জন্য সুদূর ইউরোপ পর্যন্তও যদি পৌঁছে যায় এবং সে ব্যক্তি ঈমানদারের দাবীর সহিত আম্বিয়া কেরামদেরকে গালী দেয় এবং ধর্মের প্রয়োজনীয় কার্যাদির অস্বীকার করে তা যদি "ইজমা" মুসলিমের ঐক্য-মতের বিরোধী হয়, তাহলে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মার ঐক্যমতে কাফের ও ধর্মচ্যুত। (কিতাব আশাদ্দুল আযাব ৫ম পৃষ্ঠা)

ধর্ম কুৎসাকারীর বিরুদ্ধে

মুফতী শফী সাহেবের ফতোয়া

(کفر و اسلام کی حقیقت مصنفہ مفتی شفیع)

পৃষ্ঠা ২৯—১১লাইন

کسی شخص یا کسی فرقہ کے متعلق یقینی طور سے یہ ثابت ہوجائے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے اگرچہ وہ انکار میں تاویل بھی کرتا ہو اور صاف انکار سے تھوڑی کرتا ہو لیکن تھوڑی کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ وہ بالاتفاق و باجماع امت کافر و مرتد ہے -

چونکہ مولوی قاسم صاحب نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ مولوی رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد نے شیطان لعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیع علم مانا - مولوی اشرف علی تھانوی نے الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید و عمرو بہائم و حیوان

کے علم سے تشبیہ دیا - مولوی اسماعیل صاحب نے کہا جو شخص ایک ذرہ کا علم غیب غیر اللہ کے لئے مانا وہ مشرک ہے -

(مفتی صاحب فرماتے ہیں) جن لوگوں کے یہ حال ہے ان سے اسلامی معاملہ رکھنا جائز نہیں - اور نہ ان سے کسی مسلمان کا نکاح جائز ہے الخ -

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রখ্যাত মুফতী জনাব শফী সাহেব "কুফর ও ইসলামের হাকীকত" পুস্তকে উল্লেখিত পৃষ্ঠায় বলেন, কোন ব্যক্তি বা কোন বাতিল ফের্কা সম্বন্ধে বিস্বচ্ছ ভাবে যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা দ্বীন ধর্মের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তুর অবিশ্বাসী, তা হলে তারা মুসলিম উম্মার ঐক্যমতে কাফের ও ধর্মচ্যুত হয়ে গেছে।

১। দেওবন্দী কাসেম নানুতবী সাহেব এই জন্য কাফের যে, তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন নবীর আগমনের বিশ্বাসী ছিল।

২। মৌলভী রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহী ও খলিল আহম্মদ আম্বেঠী এ জন্য কাফের-ধর্মচ্যুত যে, তারা দুজনই ঐক্যমতে বলেছেন যে, হযরত নবী করীম (দঃ) এর এলেম বা জ্ঞান বুদ্ধি শয়তান লায়িনের জ্ঞান বুদ্ধির চেয়েও কম ছিল। (নাউজুবিল্লাহ)

৩। আশরাফ আলী থানভী সাহেব বলেছেন, হুজুরে পাক (দঃ) এর সামান্য এলেম ছিল। এইরূপ সামান্য এলেম যায়েদ, আমর, হাইওয়ান ও জীব জন্তুরওতো অর্জিত ছিল।

৪। ইসমাইল দেহলভী সাহেবতো গায়রুল্লাহর জন্য এলমে গায়েব এর একেবারে বিশ্বাসী নয়। তিনি বলেন যদি কেহ এক বিন্দু বরাবর এলমে গায়েব যে, গায়রুল্লাহর জন্য সাবস্ত করবে সে কাফের মুশরিকে ভুক্ত হবে বলে তার রচিত পুস্তক তাকবিয়াতুল ঈমানে লিপিবদ্ধ করেন।

মুফতী শফী সাহেব বলেন, যারা এরূপ নবী করীম (দঃ) এর কুৎসা করে তারা নিঃসন্দেহে কাফের ও ধর্মচ্যুত, এরূপ ধর্ম কুৎসাকারীর সাথে ইসলামী মেলামেশা, আদান প্রদান শাদী বিবাহ বৈধ নয়।

নবীর কুৎসাকারীর শাস্তি

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর কুৎসাকারীর শাস্তি সম্বন্ধে শেফা শরীফ ২য় খন্ড ২০৭ পৃষ্ঠায় নিম্ন ফতোয়াটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

যদি কোন ব্যক্তি নবী করীম (দঃ)-কে গালমন্দ করে অথবা তাঁকে কোন কাজে কর্মে দোষারোপ করে অথবা তাঁর শারীরিক গঠনতন্ত্রের ত্রুটি বর্ণনা করে অথবা তাঁর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের ও বংশ চরিত্রাবলীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে অথবা কেহ হযরত নবী (দঃ)-কে এমন কোন বস্তুর সাথে তুলনা বা উপমা দেয় যদ্বারা তাঁর প্রতি কুৎসা বা তাঁর মর্যাদার হানী হয় অথবা তাঁর মর্যাদাকে হেয় করে দেখানো হয় তাহলে এরূপ ব্যক্তিকে ধর্ম অবমাননাকারী বলা হবে। ধর্ম অবমাননাকারীকে হত্যাকরা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।

শেফা শরীফের ৪র্থ খন্ডের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) হতে নিজ বা অপরকে বিজ্ঞ জ্ঞানী ধারণা পোষণ করে সে যেন তাঁকে গালমন্দ করল। এরূপ ধর্ম কুৎসাকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব।

اجمع العلماء على ان شاتم النبى صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر مرتد والوعيد عليه جار بعذاب الله له وحكمه عند الامة القتل من شك فى عذابه وكفره فقد كفر لان الرضاء بالكفر كفر (الصوم الرياض ج ع باب الاول –٣٢٨ ص) ۔

ওলামায়ে কেরামদের ঐক্যমত এই যে, হযরত নবী করীম (দঃ)-এর সমালোচক কুৎসাকারী কাফের। তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। যদি কেহ তাদের কাফের হওয়ার মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে সেও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। কেননা কুফরী কর্মের সমর্থকও কাফের।

প্রিয় পাঠক ঃ দেওবন্দী ওহাবী আকীদা পোষণকারীগণ এই ফতোয়ার আওতাভুক্ত কিনা প্রত্যেক পাঠক তা ভেবে দেখুন! আমরা তাদেরকে কাফের বলতে চাই না, তবে তাদের লিখিত ফতোয়া দ্বারাই তারা নিজেরা কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হতে সক্ষম কিনা ? তা আপনারাই বিচার করুন।

দেওবন্দীগণের তওবাবলী

অনেক ইসলামী ফতোয়ায় দেওবন্দীগণকে কাফের ও ধর্মচ্যুত নামে আখ্যায়িত করা হয়। এরা প্রকৃতপক্ষে কারা ? সকল দেওবন্দীরাতো কাফের হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, শিব্বির আহম্মদ ওসমানী ও হোসেন আহম্মদ মাদানীর মতো আরো অনেক প্রখ্যাত প্রখ্যাত আলেমগণওতো দেওবন্দী ছিলেন। এরাতো ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী দেওবন্দীগণকে ঘৃণা করতেন। তাঁরা দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে নজদী ওহাবী আকীদা উৎখাত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁরা কোন দিন কাফের ছিলেন না।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রশিক্ষিত এক সংঘবদ্ধ দল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ভ্রান্ত নীতিমালাকে ভারত উপমহাদেশে প্রচারের এক ক্ষীণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

দেওবন্দীদের উপর অনেক ফতোয়াতে কুফরী ও ধর্মচ্যুতীর বিধান অর্পিত হয়েছে। আবার দেওবন্দীদের মধ্যে অনেক আলেম নজদী ও

ওহাবী নীতিমালাকে বর্জন করে তার বিরুদ্ধে ফতোয়াও রচনা করেছেন। যেমন আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী শিব্বির আহম্মদ ওসমানী ও হোসেন আহম্মদ মাদানী প্রমুখ।

আবার দেওবন্দ মাদ্রাসাতে এমনও কতিপয় লোক ছিল যারা নজদী নীতিমালাকে ভারত উপমহাদেশে রূপান্তর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ছিল। যেমন ইসমাইল দেহলভী, কাশেম নানুতভী, রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহী, খলিল আহম্মদ আম্বুটি, আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ।

দ্বিতীয় ধরণের দেওবন্দীগণ নিজ নিজ অপকর্ম হতে তওবা করে ছিলেন কিনা এই বিষয়ে আশরাফ আলী থানভীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ উর্দু বাক্যটি উচ্চারণ করেন :

ھم نے اجتک کسی کتاب و تحریر میں انکی توبہ
ھر کرلہ دیکھی ۔

অর্থাৎ আমি আজ পর্যন্ত কোন কিতাব বা লিখনীর মধ্যে দেওবন্দীগণের কখনও তওবা করেছে বলে দেখিনি।

জনাব রশিদ আহম্মদ গঙ্গুহীকে ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক রচিত তথাকথিত "তাকবিয়াতুল ঈমান" পুস্তক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অর্থাৎ এই পুস্তকের মধ্যে অনেক ধর্মনাশা উক্তি ও কুফরী কালামে পরিপূর্ণ। তাই অনেকের ধারণা যে, ইসমাইল সাহেব নিজ অপকর্ম ও কুফরী কালাম হতে তওবা করে মৃত্যু বরণ করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে।

জনাব রশিদ আহম্মদ গুঙ্গুহী জবাব হিসেবে বলেন।

توبہ کرنا ان کا بعض مسائل سے محض افتراء ھے
اھل بدعت کا ۔ (فتوی رشیدیہ)

অর্থাৎ ইসমাইল দেহলভী যে তাকবিয়াতুল ঈমান পুস্তকের কতিপয় বিষয় হতে তওবা করে ছিলেন অভিমতটি বেদয়াতীদের মিথ্যা গুজব।

এ ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরাম ইসমাইল দেহলভীর তওবা করে মৃত্যু বরণ করা বা তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা বিষয় নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। যাঁরা বলেন ইসমাইল দেহলভী তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাঁদের নাম যথাক্রমে এই :

১। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পরনানা আল্লামা মনওয়ার উদ্দিন দেহলভী।
২। আল্লামা মাখসু সুল্লাহ, (শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর ভ্রাতুষ্পুত্র)
৩। আল্লামা মুসা সাহেব (শাহ রফিউদ্দিন দেহলভীর পুত্র)
৪। আল্লামা ফজলে রাসুল ওসমানী (রহঃ)।
৫। আল্লামা ফজলুল হক খায়রাবাদী (রহঃ) (অগ্রনায়ক আজাদী আন্দোলন)
৬। আল্লামা আহমদ রেজাখানের পীর সাহেব।

নজ্দী পরিচয়

ব্রিটিশ সম্রাটের গোয়েন্দা অফিসার মিঃ হামফ্রের ডায়েরীতে

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ঈমান আকীদা ও চরিত্র।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ফাটল ধরাবার উদ্দেশ্যে বহু ভাষাবিদ "মিঃ হামফ্রে" কে গোয়েন্দা নিযুক্ত করে। হামফ্রের ডায়েরীতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ঈমান, আকীদা ও চরিত্রাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে। "হামফ্রের" উক্ত ডায়েরী খানা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মানীদের হস্তগত হয়। তখন জার্মান পত্রিকা "ইসপিগল" ডায়েরী খানা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে। এতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ঈমান, আকীদা ও চরিত্রাবলীর সম্যক ভাবে জানা যায়।

"হামফ্রের" ডায়েরী খানাতে মিঃ হামফ্রে বলেন, আমি যখন তরখানের গোয়েন্দাগিরীতে নিয়োজিত ছিলাম তখন একজন মুসলিম ধর্ম সংস্কারক লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সেই ব্যক্তি তুর্কী, ফার্সী ও আরবী ভাষায় কথা বার্তা বলতে পারতেন। তিনি দ্বীনীতালেবে ইলেমের পোষাক পরিধান করে এ দিক সে দিক বেড়াতেন। তিনি বড় উচ্চাভিলাসী উচ্চ মর্যাদাকাংখী ব্যক্তি ছিলেন। মিঃ হামফ্রে তার পরিচিতি চাইলে, তিনি অত্যান্ত অহংকারের সাথে বললেন, আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী। নজদী সাহেব তৎকালীন তুরস্কের ওসমানী সরকারের প্রতি

অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করতেন। তার দৃষ্টিতে হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের কোন মর্যাদা ছিলনা।

নজদী সাহেবের বক্তব্য হল ঃ আল্লাহর কোরআনে যা আছে তাই আমল যোগ্য। মিঃ হামফ্রে বলেন নজদী সাহেব প্রয়োজন হলে নিজ অভিমতের পক্ষে ইমাম ইবনে 'তায়মিয়ার' মতামত প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন। আম্বিয়া, সাহাবা ও আওলীয়ায়ে কেরাম তার নিকট ছিল অতি তুচ্ছ। মিঃ হামফ্রে ভেবে দেখলেন যে, নজদী সাহেবের মত স্বাধীনচেতা লোক আমার দরকার। এরূপ লোক দ্বারা ইসলামী সমাজে ফাটল ধরানো সহজ হবে। তাই তিনি নজদী সাহেবকে তরখানের ডাক বাংলায় আমন্ত্রণ করেন। নজদী সাহেবও আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

তরখানের ডাক বাংলায় মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর দাওয়াত

মিঃ হামফ্রের আমন্ত্রণে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী তরখানের' ডাক বাংলায় নিদৃষ্ট সময়েই উপস্থিত হন। যে দিন নজদী সাহেব ডাক বাংলায় উপস্থিত হন সে দিন ডাক বাংলার খাবার টেবিলে শিয়া তর্কবিদ শেখ জাওয়াদ কুম্মী সাহেবও উপস্থিত হন। মিঃ হামফ্রে উভয় ধর্ম সংস্কারককে খাবার টেবিলে খাবার দেন। খাবার মধ্যে দু'জন সংস্কারক পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হন। কারণ ওহাবী ও শিয়া মতবাদের মধ্যে মাযহাবী মতভেদ ছিল অনেক।

খাবার পর শেখ জাওয়াদ মিঃ হামফ্রেকে গোপনে বলল ঃ এই নজদী সাহেব বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যাবলীকে কার্যকরী করার জন্য উপযোগী হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাকে যেভাবেই হউক কাবু করতেই হবে। তাই শেখ জাওয়াদ ক্রমে ক্রমে নজদী উচ্চাভিলাসী, আত্মপুজারীকে জড়ায়ে ফেলার চেষ্টা করে। এমনকি শেখ জাওয়াদ নজদী সাহেবকে ফাঁদে ফেলার জন্য তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করল। সামান্য কিছু দিনের মধ্যে উভয় ধর্ম সংস্কারকের মধ্যে অস্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

শেখ জাওয়াদ বলেন, আমি নজদী সাহেবের সঙ্গে কোরআন হাদীস নবী, সাহাবা ও আওলীয়ায়ে কেরামগণের সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। নজদী সাহেব এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

শিয়া-ওহাবীর মধ্যে ধর্মীয় আলোচনার প্রথম দিনে।

"মুতা বিবাহ" শিয়াপন্থী শেখ জাওয়াদ সাহেব মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে নজদী সাহেব। মহিলাদের সাথে (মুতা) অস্থায়ী বিবাহ করা সম্পর্কে আপনার রায় কি ? নজদী সাহেব বললেন, মুতা বিবাহ হারাম এতে কোন সন্দেহ নেই।

শেখ জাওয়াদ সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন, যদি মুতা বিবাহ হারাম হয়, তবে কোরআনে উহাকে জায়েজ ঘোষণা দেওয়া হল কেন ? যেমন সুরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা কোন মহিলার সঙ্গে মুতা বিবাহ করতে ইচ্ছুক হও তবে তাদের মোহরানা আদায় করে দিও।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব পাল্টা উত্তর করেন, শেখ সাহেব! আল্লাহর কোরআনের আসল অর্থ সকলের বুঝা বড় মুশকিল। কোরআনের আয়াত একেবারে নিজ স্থানে সঠিক আছে। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, মুতা হযরত রাসুলে পাক (দঃ)-এর যুগে প্রচলিত ছিল। এখন আমি উহাকে হারাম বলে ঘোষণা দিলাম। আজ হতে যদি কেহ অস্থায়ী বিবাহে লিপ্ত হয়, আমি তার গর্দান উড়ায়ে দিব।

শেখ জাওয়াদ এই উত্তর শ্রবণে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, হে ওহাবী সাহেব। আপনি কি হযরত ওমর (রাঃ)-কে অনুসরণ করেন ? অথচ আপনি হযরত ওমর (রাঃ) হতে অধিক জ্ঞানী। হযরত ওমর (রাঃ) এর কি ক্ষমতা আছে যে, সে আল্লাহ ও রাসুলের বিধানকে নাড়াচাড়া করবে। আর আপনি অস্থায়ী বিবাহকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে কোরআনের সিদ্ধান্তের বিপরিত করছেন। (আস্তাগ ফিরুল্লাহ)

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী আমতা আমতা করে বললেন, আজ হতে আমি মুতা বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ ঘোষণা দিলাম।

শেখ জাওয়াদ উক্ত উত্তর পাওয়ার পর ওহাবী সাহেবের যৌন উত্তেজনাকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। ওহাবী সাহেব যখন মুতা বিবাহ বৈধ ঘোষণা দিলেন তখনও তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

শেখ জাওয়াদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মুতা বিবাহ করে নিজের জীবন আনন্দদায়ক করতে চান ?

নজদী সাহেব মাথা নাড়া দিয়ে মুতা বিবাহের সম্মতি দিলেন। অতঃপর শেখ জাওয়াদ ওয়াদা দিলেন যে, আমি ইহার একটা ব্যবস্থা করবো "ইনশাআল্লাহ"। তবে শেখ জাওয়াদের ভয় হল যে, ওহাবী সাহেব বসরার সুন্নীদের ভয়ে ভীত হয়ে যায় নাকি। কারণ সুন্নীরা মুতা বিবাহকে হারাম বলেন। শেখ জাওয়াদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে বললেন, ভাই নজদী। আমার ওয়াদা সঠিক পাবেন এবং আমার প্রোগ্রাম একেবারে

গোপন থাকবে। এমনকি আপনি যে রমনীর সঙ্গে মুতা করবেন তার নিকটও আমি আপনার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবোনা।

একথা বলার পর শেখ জাওয়াদ বলেন, আমি মুতার ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট পাড়াতে চলে আসলাম। বসরায় ইংরেজ উপনিবেশ সরকারের পক্ষ হতে চরিত্র নষ্টের জন্য খৃষ্টান এক সুন্দরী রমনী নিয়োজিত ছিল। সে মহিলার নিকট আমি সবিস্তারে মুতার পরিকল্পনার কথা বললাম। সে মহিলা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের সঙ্গে মুতা করতে রাজীও হল। তখন আমি সে মহিলার তথাকথিত নাম রাখলাম “সুফিয়া” আর আমি মহিলাটিকে বললাম যথা সময়ে নির্ধারিত ব্যক্তিকে তোমার নিকট নিয়ে আসবো।

নির্দিষ্ট রাতে আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেবকে সঙ্গে করে তথাকথিত সুফিয়ার নিকট পৌঁছে গেলাম। তিনি এক আশরফীর বিনিময়ে সুফিয়াকে মুতা বিবাহ করলেন। অতঃপর অবিবাহিত যুবকের স্বাধীন চিন্তাধারার নতুন স্বাদ পান করলো সুন্দরী সুফিয়া।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সুফিয়ার যাঁতাকলে পড়ল

শরাব পান ঃ শেখ জাওয়াদ ইরানী সাহেব মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে মুতা বা অস্থায়ী বিবাহের নাগাল পাশে আবদ্ধ করার পর দিন আবার তার সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনায় বসেন।

এবার শেখ জাওয়াদ নজদী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, হে শেখ সাহেব শরাব সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? এজিদ, মালেক ও সুলায়মানের মতো বনু উমাইয়ার খলিফাগণসহ বনু আব্বাসগণওতো শরাব পান করতেন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, হে শেখ জওয়াদ! শরাব সম্বন্ধে এত কথার প্রয়োজন কি? শরাবের বিধান হল এই যে, শরাব হালাল তবে শরাবের নেশা হারাম। শরাবের নেশা হতে পরিত্রান লাভের জন্য হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) শরাবে পানি মিশিয়ে পান করতেন।

শেখ জাওয়াদ যখন দেখলেন নজদী সাহেব শরাব বৈধ হওয়ার সম্বন্ধে নরম নরম ভাব পোষণ করছেন, তখন শরাবের কথাটা সুফিয়ার কানে পৌঁছায়ে দিলেন। শেখ জওয়াদ সুফিয়াকে একথাটাও বলে দিলেন যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে যত বেশী পার শরাব পান করায়ে দিও।

পরের দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী শেখ জওয়াদকে আলোচনার পূর্বাহ্নে কানে কানে বললেন, ভাই! আজ সুফিয়ার সঙ্গে বড় আনন্দ পেয়েছি। কারণ সে আমাকে গত রাত্রে পেট ভরে শরাব পান করায়েছে। শেখ জওয়াদ বলেন একথাটা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। তখন নজদী সাহেব বললেন, আপনি সুফিয়াকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

শেখ জওয়াদ সুফিয়াকে জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার? সুফিয়া শেখ জাওয়াদকে দেখার সাথে সাথে বলতে থাকে গত রাত্রে আমার নতুন প্রিয়তম প্রাণ ভরে শরাব পান করেছে। এমনকি তিনি আত্মহারা হয়ে খলস খলস করে কাশতে কাশতে চিৎকার করতে থাকেন। শেষ রাতে তিনি আমার সঙ্গে কয়েক বার মাশগুলও হন। এখনও তার শরাবের নিশা কমেনি।

এই চরম ঘটনার পর মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব সুফিয়াকে পূর্বের চেয়ে অত্যান্ত আদর করতে থাকেন। আর প্রতিটি সপ্তাহে মুতার সময়সীমা বাড়াতে থাকেন।

শেখ জাওয়াদ বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব সুফিয়ার আদর সমাদরে মনমুগ্ধ হয়ে আমাকে আর একটি আনন্দময়

ঘটনার গোপন কথা বলতে শুরু করলেন যে, আমি ইসপাহানে ধর্ম সংস্কারের সময় সেখানে আবদুল করিম নামের এক ব্যক্তির সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমি সেই ব্যক্তির নিকট আমার সকল গোপন কথা বলতাম। সে আমার জন্য ইসপাহানে একজন অবিবাহিতা রমনীর সঙ্গে মুতা বিবাহ করান। তবে ইসপাহানের মুতার বিবাহ হতে শেখ জাওয়াদ ইরানী কর্তৃক বিবাহটি আমার নিকট অধিক আনন্দ দায়ক অনুভব হয়েছে। তবে আবদুল করিম সাহেব সিরাজ রাজ্যে আমার জন্য একটি রমনীর সঙ্গে মুতা বিবাহের ব্যবস্থা করেছিল, সেই রমনীটি সুফিয়ার তুলনায় অধিক সুন্দরী ছিল। তবে মেয়েটি ইহুদী ছিল, তার নাম ছিল আসিয়া।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব শেখ জাওয়াদের নিকট এসব কথা গল্প স্বরূপ ব্যক্ত করে আনন্দ উপভোগ করতেন।

ওহাবী মাযহাব স্বপ্নের মাযহাব ঃ শেখ জাওয়াদ বলেন, আমি একদিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে একটি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করি, যার বিবরণ নিম্নরূপ। এক রাত্রে আমি রাসুলুল্লাহ (দঃ)-কে কুরসীর উপর উপবিষ্ট দেখি। তিনি উপস্থিত জনতাকে নসিহত করছেন। সে মজলিসে অনেক বড় বড় আলেম ওলামা পীর বুজর্গানেদীন উপস্থিত ছিলেন যাদের কাউকে আমি চিনিনা। তাঁরা হুজুরে পাক (দঃ) কে ঘিরে বসেছেন। এমতবস্থায় আমি দেখি আপনি (নজদী) সে মজলিসে আস্তে আস্তে প্রবেশ করতেছেন। আপনার চেহারা হতে নূরের তাজাল্লী বিকশিত ছিল। যখন আপনি হুজুরে পাক (দঃ) এর সম্মুখে পৌঁছলেন, তখনই হুজুরে পাক (দঃ) কুরসী হতে উঠে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং হুজুরে পাক (দঃ) স্বয়ং নিজেই আপনার মাথা চুম্বন করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে আমার একই নামের অধিকারী মুহাম্মদ (বিন আবদুল ওহাব) তুমি আমার এলেমের ওয়ারিশ, মুসলমানদের দীনকে বিশ্বে প্রচার করার জন্য তুমি আমার যথার্থ খলীফা রূপে চিহ্নিত। হুজুরে

পাক (দঃ)-এর এই উপদেশবাণী শুনে আপনি (নজদী) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ। মানুষের কাছে আমার মনের কথাটি প্রকাশ করতে ভয় হয়। হুজুরে পাক (দঃ) বললেন, হে মুহাম্মদ নজদী! মানুষের ভয়কে অন্তরে স্থান দিবে কেন? তুমি যা কিছু ভাবনা করছ তার চেয়ে তুমি অনেক বেশী মর্যাদাশীল।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব, শেখ জাওয়াদের এই বানোয়াট স্বপ্নের কথা শুনে আত্মহারা হয়ে গেল। তিনি বারংবার শেখ জাওয়াদকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। ভাই তোমার স্বপ্নকি সদা এইরূপ সত্য হয়? জবাবে শেখ জাওয়াদ তাকে বলেন, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

এই তথাকথিত স্বপ্নের পর হতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের মনে ওহাবী মাযহাব পত্তন দেয়ার আগ্রহ জন্মে। এই ওহাবী মাযহাবটি পরবর্তীকালে ওহাবী আন্দোলন ও সংস্কার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে তাদের সামনে "ওহাবী" কথা বললে, উহা জেনেও নাজানার ভান করে। আর বলে ওহাবী কে ও কারা আমরা জানিনা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ওহাবী নীতিমালা ষোলআনার বত্রিশ আনা পালন করেন।

বড় আশ্চর্য হতে হয় যে, যারা ওহাবী চেনেনা তারা কি করে অক্ষরে অক্ষরে ওহাবী মাযহাব পালন করেন? আসলে তারা সব চিনে ও জানে। আসল কথা হল যে, ভূতে পেলে দুয়ার পিটে। হেকিমুল উম্মত চিনেন, অথচ শাইখুল হিন্দ চিনেন না?

ওহাবী আন্দোলনের ৬ দফা কর্মসূচী

ব্রিটিশ উপনিবেশিক পুণর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী সাহেব ওহাবী মাযহাব পরিচালনার জন্য নিম্নে বর্ণিত ৬ দফা কর্মসূচী প্রনয়ণ করে দেন।

১। যারা মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর মাযহাবে সামীল হবেনা তারা এক বাক্যে কাফের। তাদের ধন সম্পদ ইজ্জত সম্মান বিনষ্ট করা হালাল। তাদেরকে পশুর হাটে নিয়ে বেচা কেনা করা অপরিহার্য।

২। মূর্তিপূজা রহিত করার বাহানা করে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করে দেয়া। মুসলমানকে হজ্জব্রত থেকে বিরত রাখা এবং হজ্জব্রত পালনকারীদের জান মাল লুন্ঠণ করার জন্য আরবের যাযাবর জাতিকে উত্তেজিত করা।

৩। আরব উপজাতি ওসমানিয়া (তুর্কী) খলীফার আদেশাবলী পালন না করা। খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁদেরকে তাদের আসন হতে উৎখাত করা।

৪। নবী, সাহাবা, আওলীয়া ও বুজর্গানে দীনকে অবহেলা করা।

৫। মুসলিমদেশ সমূহের মধ্যে মাযহাব প্রচারের নামে ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করা।

৬। কোরআন শরীফে যত নবী ওলীর বর্ণনা আছে তা মুছে দিয়ে সংক্ষেপে একটি নতুন আধুনিক কোরআন তৈয়ার করা।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী সাহেব বলেন, উপরে উল্লিখিত কর্মসূচী প্রনয়ণ করতে আমাদের অন্তত দু'টি বছর সময় লেগেছে।

১১৪৩ হিজরী সনের মাঝামাঝি সময়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব জাজীরাতুল আরবের মধ্যে তার নতুন ধর্মমত ঘোষণার জন্য চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার মতাদর্শটিকে তার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে প্রচার করে। যখন তার এই গোপন দাওয়াতের কথা জাজীরাতুল আরবে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার শত্রু বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি তার ভাই শেখ সোলাইমান এই ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদ করার কারণে মদীনায় গিয়ে আত্ম গোপন করে থাকতে হয়েছিল। মদীনার মালেকী, শাফেয়ী মযহাবের ইমামগণ রেসালা ও চিঠির মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে সতর্ক করেছেন যে, তুমি তথাকথিত ধর্মমত প্রচার হতে ক্ষান্ত হও।

এই কঠিন মুহূর্তে শেখ জাওয়াদ ইরানী সাহেব নজদী সাহেবকে এই বলে সান্তনা দিলেন যে, আপনি ধৈর্য হারাবেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নবুয়তের প্রাথমিক দিনগুলোতেও এইরূপ কঠিন অবস্থা হয়েছিল। ইরানী সাহেব আরো সান্তনা ও উপদেশ বাণী বলেন: যখন আপনি নিজের ধর্মমত প্রকাশ করে ফেলেছেন, আর যারা আপনার নীতিমালার বিরোধিতা করবেন তাঁদেরকে ছলে বলে কলে কৌশলে বাধা করার চেষ্টা করবেন। আমিতো আপনার সাথে আছি-ভয় করবেন না।

ওহাবী ৬ দফার দুরাবস্থা

ব্রিটিশ কর্তৃক দেয়া ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব বড় দুরাবস্থায় পড়ে গেল। জাজীরাতুল আরব এ তার বিরুদ্ধে বড় ধরণের আন্দোলন খাড়া হয়ে গেল। এক দিন ১২৬জন আরববাসী শেখ নজদীকে হত্যা করার লক্ষ্যে তার বাসস্থানে

প্রবেশ করে। শেখ জাওয়াদ ইরানী সাহেব বলেন, আমি যদি তথায় না থাকতাম তাহলে তারা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে হত্যা করে ফেলত। আমি অতি দ্রুততার সাথে হস্তক্ষেপ করে হত্যাকারীদের চক্রান্তকে নস্যাত করে ফেলি।

অবশেষে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী আমাকে বলল, ৬ দফার দু'টি অন্যতম দফার প্রচার কার্য আপাতত বন্ধ রাখতে হবে। প্রথমতঃ কা'বাঘর ধ্বংস করা এত সহজ নয়। বিশ্ব মুসলিম উহা সহজে মেনে নিবেন না। এছাড়া হজ্জব্রত পালনের কাজ বন্ধ করা বড় কঠিন ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ নতুন কোরআন শরীফ আধুনিক তরীকায় লিপিবদ্ধ করা আরো কষ্টকর কাজ। কারণ ইস্তাম্বুলের শাসকগণ আমার উপর পূর্ব হতে বড় নাখোশ রয়েছেন। ইবনে ওহাব বলল, আমি যদি কা'বাঘর ধ্বংস করি এবং আধুনিক কোরআন তৈরী করি তবে এতে তুর্কী ওসমানী সরকার আমার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে।

শেখ জাওয়াদ বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের উপরে উল্লেখিত যুক্তিগাথা কথাগুলো আমার ন্যায় সঙ্গত মনে হলো। তাই আমি তাকে দু'দফার কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাবদ্ধ করে রাখার উপদেশ দিলাম। নজদী সাহেবও এতে সম্মত হলেন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী গোপনে গোপনে ৪ দফা কর্মসূচীর প্রচার কার্যে লিপ্ত থাকেন। তারপর ব্রিটিশ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় সংস্থা নির্দেশ করলো যে, জাজীরাতুল আরবে ওহাবী আন্দোলনকে রাজনৈতিক ভাবে প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজনের খাতিরে ব্রিটিশ সরকার নিজ সংস্থাকে নির্দেশ দিল যে, তোমরা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ কর। সংস্থা গোপনে গোপনে মুহাম্মদ ইবনে সাউদকে ওহাবী নীতিমালার ভক্ত করে নিল। তিনি সাউদী বংশের প্রথম বংশধর ছিলেন। তিনি ১১৪৭ হিজরী সনে

ওহাবী মাযহাব গ্রহণ করেন। অন্য দিকে তিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হতে নজদের শাসনকর্তাও ছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ও ইবনে সাউদ উভয়কে তাকিদ করেন যে, ধর্মীয় বিষয়ের ফয়সালার পূর্ণভার মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর উপর ন্যাস্ত থাকবে এবং রাজনৈতিক বিষয়ের দেখাশুনা ইবনে সাউদ করবেন। ব্রিটিশ সরকারের উক্ত ফরমানকে কার্যকরী করার জন্য নজদের "দারইয়া" শহরকে কর্মস্থল ঘোষণা দেন। আর কেন্দ্রীয় সরকার হল স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার।

৬ দফার সাথে আরো কয় দফা সংযোজন

ইংরেজ প্রণীত ৬ দফা কর্মসূচীর মধ্যে দু'টি দফার বাস্তবায়ন কষ্টকর ও কঠিন মনে করে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ও ইবনে সাউদ উক্ত ৬ দফার সাথে আরো কয়েকটি ধর্মনাশা দফা সংযুক্ত করল। উহা এই ঃ

১। মহানবী রাসূলে পাক (দঃ)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত উদ্দেশে সফর সূচী গ্রহণ করা হারাম ও নিষেধ। যেমন ইবনে তাইমিয়া ৬২৬ হিজরী সনে রওজা শরীফ জিয়ারত করাকে হারাম ফতোয়া প্রদান করছিল। (তাই ইবনে তাইমিয়াকে দামেশকের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ গ্রেফতার করে অবশেষে তাকে দামেশকের কিল্লায় কতল করা হয়)।

২। হযরত নবী করীম (দঃ) এর জীবন্দশায় অচল মানুষ রূপে চিহ্নিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর থেকে কোন উপকারের আশা করা যায় না।

৩। হযরত নবী করীম (দঃ)-এর অদৃশ্যের জ্ঞান বুদ্ধি বলতে কোন কিছু ছিলনা। অর্থাৎ ইলমে গায়েব বলতে তিনি কিছুই জানতেন না। গায়েব জানার আকীদা পোষণ করা শিরিক। (এই কথার উপর সকল দেওবন্দী ঐক্যমত)।

৪। আম্বিয়া, সাহাবা, গাউস কুতুবদের সঙ্গে মহব্বত রাখা হারাম। (এ কথায় সকল দেওবন্দীর একমত)

৫। সাহাবা, আওলাদে রাসূল ও নবীদের কবর ভেঙ্গে দেয়া ফরজ। (বর্তমানে সাউদী সরকার এই ফরজটি যথাযথভাবে পালন করছে) যারা পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশে পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফে গিয়েছেন তারা অবশ্যই তা স্বচক্ষে দেখেছেন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ধর্মীয় সংস্কারের নামে রাজনৈতিক তৎপরতার অকৃত্রিম ইতিহাস।

মুক্তি সংগ্রাম ঢাকা-বাংলা একাডেমী
৩১/১/৮৬ ইং ১৭ই মাঘ ১৩৯২ বাং
দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত।

ডকটর এ, আর মল্লিক "ব্রিটিশ নীতি" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়েক দশক ধরে যে ওহাবী আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের বংগীয় এলাকা থেকে শুরু করে সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো, এখনই আলোচনার সুবিধার্থে সেই ওহাবী আন্দোলনের গোড়ার কথা বলতে হয়।

ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক ছিল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব। তার জন্মতারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক

ভাবে অধ্যয়নের পর বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমন কালে ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যাদান করেন এবং তাঁর ভাষায় শাসক কর্তৃপক্ষের সমালোচনায় মুখর হন। এ সময় আরবের অধিকাংশ এলাকাই তুরস্কের সুলতানের অধীনে ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের এই সব বক্তব্য তুর্কী সুলতানের জন্য খুবই বিরক্তির কারন হয়ে দাঁড়ায় এবং অচিরেই তাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই-ই নয় তুর্কী সাসক কর্তৃপক্ষ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সিরিয়ার দামেস্ক শহর থেকে বহিস্কার করেছেন।

সাহিত্যিক "ওলীউল্লাহর" মতে তিনি এই স্থান সেই স্থান পরিভ্রমণে বহুদিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে দেরইয়ার সরদার মুহাম্মদ বিন সৌদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারই সাহায্যে তিনি বেদুঈনদের সমবায়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন পূর্বক প্রথম সুযোগে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। এইরূপে অতি অল্প কালের মধ্যে মরু অঞ্চলে বিশেষ করে নজদ প্রদেশে আবদুল ওহাব নজদীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ বিন সৌদের সহিত তার এক ভগ্নিকে বিবাহ দিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব সমগ্র নজদের শাসন ক্ষমতা তার হাতে অর্পন করে শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে স্বয়ং সর্বময় কর্তা হয়ে রইলেন। (মুক্তি সংগ্রাম বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৮)

বাগদাদের তুর্কী শাসনকর্তা নজদের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে দমন করার লক্ষ্যে ১৭৫৮ খৃঃ বিরাট সেনাবাহিনীর দল প্রেরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তুর্কীবাহিনী পরাজিত হলে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব একটি নিয়মিত সৈনাবাহিনী গঠন করেন।

১৭৯১ সালে ওহাবীরা পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। ১৭৯৭ সালে তারা বাগদাদ আক্রমণ করে ইরাকের একটি এলাকা নজদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য তুর্কী সুলতান এই ওহাবীদের কার্যকলাপে এতো দূর বিরাগভাজন হয়েছিলেন যে, এদের হজ্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করেছিলেন। এখানে আরো একটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের অনুসারীরা সব সময়েই ইসলামের নামে নিজেদেরকে মুবাল্লেগ মুজাহিদ হিসেবে পরিচয় দিতেন। অন্যদিকে গোপনে গোপনে নিজেদের ভ্রান্ত মাযহাব প্রচারে রত থাকতেন।

১৮০১ সালে আবার প্রায় লক্ষাধিক ওহাবী মুজাহিদ পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে। কয়েক মাস ব্যাপী এই যুদ্ধে মক্কা নগরী ওহাবীদের দখলে আসে এবং সে সময়ে তুর্কী শাসনের বিলুপ্তি ঘটে।

১৮০৩ সাল নাগাদ ওহাবীরা পবিত্র মদীনা নগরীর উপর আক্রমণ পরিচালিত করে উহার উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে। সাহাবা আওলীয়া ও ওলামা কেরামদের মাজার ও সৌধ ভেঙ্গে দেয়। এমনকি রাসূলে পাক (দঃ) এর রওজা পাকের একাংশও তাদের হাত হতে রক্ষা পায় নি।

এদিকে পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরী দু'টি হস্তচ্যুত হওয়ায় তুর্কী খলিফা খুবই রাগান্বিত ছিলেন। এছাড়া ওহাবীরা হুজুরে পাক (দঃ) এর রওজাশরীফের অংশবিশেষ ভেঙ্গে দিয়েছে, এ কথাটা এবং অন্যান্য কয়েকটি অভিযোগ তুর্কীরা সমগ্র বিশ্বে বিশেষতঃ মুসলিম দেশগুলোতে রটিয়ে দিল। যার ফলে ১৮০৩ থেকে ১৮০৬ খৃঃ পর্যন্ত বহিরাগত হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল।

এই রকম এক পরিস্থিতিতে মিশরের শাসনকর্তা (খেদিব) মোহাম্মদ আলী পাশা তুরস্কের সুলতানের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ওহাবীদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইস্তাম্বুলের নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত লড়াইয়ে ওহাবীগণ চরমভাবে পরাজিত হয়।

১৮১২ খৃঃ মিশরীয় বাহিনীর সেনাপতি "স্কটিশ টমাস কীর্থ" এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা দখল করে।

১৮১৩ খৃঃ সেনাপতি কীর্থ মক্কা নগরীও অধিকার করে নেয়। পরবর্তী পাচ বছরের মধ্যে ওহাবীদের সামরিক শক্তি একেবারেই শূন্যের কোঠায় এসে যায়। অতঃপর বাদবাকী ওহাবীরা ইসলামী মোবাল্লেগ নামধারণ করে ধীরে ধীরে গোপনে গোপনে ওহাবী মাযহাব পালন করতে থাকে। যা বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পায় ভারতের দেওবন্দ নামক স্থানে।

ইসলামের পরম শত্রু

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার শোচনীয় মৃত্যু

(জন্ম ৬৫২ হিঃ মৃত্যু ৭২৬ হিঃ শাবান)

ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী মাযহাব পন্থী ওহাবী মাযহাবের তথাকথিত একজন ইমাম ছিল। কারণ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এবং তার ওহাবী মাযহাবপন্থীগণ পূর্বাপর তারই অনুসরণ করে আসছে। ইবনে তাইমিয়ার মাযহাবী নীতিমালাতে রয়েছে, আম্বিয়া, আওলীয়া ও শহীদানদের মাজার শরীফ জিয়ারত করার জন্য সফর করা হারাম। এই নাস্তিক ইমাম যখন দামেশ্‌কে অবস্থান করছিল তখন একটি ফতোয়ার মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিল যে, মহানবী হুজুরে পাক (দঃ)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হারাম। যদি কোন ব্যক্তি ভুল করে জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করলো তবে তার চলন্ত পথে নামাজ কসর করার আদৌ প্রয়োজন হবে না।

ইবনে তাইমিয়া স্বঘোষিত ফতোয়াতে আরো বলেন, রাত ও দিন পরস্পর লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা যে, মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর দরবার শরীফে আগমণ করতেছেন বলে মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদবাক্য রয়েছে, তা একেবারে মিথ্যে কথা। যদি ফেরেশ্‌তা দৈনন্দিন রওজা পাকে অবতরণ করে থাকেন তা সত্য হলে তাঁরাও হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

ইবনে তাইমিয়ার উক্ত ধর্ম কুৎসাসম্বলিত ফতোয়াখানা ঘোষিত হওয়ার পর মিশর, শাম ও দামেশকের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে আঘাত লাগে। বিশেষ করে শামদেশীয় মুসলমানগণ ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়ার প্রতিবাদ করেন। এ নাস্তিক ইমামের উক্ত কুফরী ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শরীয়ত সম্মত কি সাজা দিতে হবে সে সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরাম হতে ফতোয়া তলব করা হয়।

আল্লামা বোরহান বিন ফারকাহ্ ফজারী ও আল্লামা শিহাব বিন জাবহাল উভয় ধর্মীয় মুফতী সাহেবান কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একটি ৪০ পৃষ্ঠার ফতোয়া রচনা করেন। সে ফতোয়াতে ইবনে তাইমিয়াকে কাফের ও ধর্মচ্যুত বলে ফতোয়া প্রদান করেন। আবার সেই রচিত ফতোয়াখানাকে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবীয় কাজীগণের সমীপে পেশ করা হয়।

১। কাজী বদর বিন জামহা, যিনি শাফেয়ী মাযহাবের সরকারী কাজী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ইবনে তাইমিয়াকে এরূপ মিথ্যা ও ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়া হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হউক। সে এই আদেশের বরখেলাফ করলে তাকে গ্রেফতার করে পিটুনীর নির্দেশ প্রদান করেন।

২। কাজী মোহাম্মদ বিন জারিরী, যিনি হানাফী মাযহাবের কাজী নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, ইবনে তাইমিয়াকে বিনা শর্তে গ্রেফতার করে কতল করা হউক। কারণ ধর্ম কুৎসাকারী ধর্মচ্যুতেরই শামিল।

৩। কাজী মোহাম্মদ বিন আবুবকর যিনি মালেকী মাযহাবের ইমাম ও কাজী নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বলেন, ইবনে তাইমিয়াকে এরূপ ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়া হতে বিরত রাখা হউক।

৪। কাজী মোহাম্মদ বিনওমর মাকদাসী যিনি হাম্বলী মাযহাবের কাজী নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, ইবনে তাইমিয়াকে সাধারণ শাস্তি দেয়া হউক।

উক্ত চার জন কাজীর রায়ের মধ্যে হানাফী মাযহাবের কাজীর রায়কে প্রাধান্য দিয়ে ইবনে তাইমিয়াকে শাবান মাসের ৭২৬ হিজরী দামেশকের কিল্লাতে বন্দী করা হয়। ৭২৮ জিলকদ মাসের ২০ তারিখ বন্দী অবস্থায় সেখানে বড় দুরাবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। (সাফুস্‌সাকিল আল্লামা কাওসারী ১৫৬ পৃষ্ঠা)

খারেজী মাযহাব

খারেজী মাযহাব ঃ ইহা ইসলাম বহির্ভূত প্রতারকদের নতুন আবিষ্কৃত মাযহাব। এই তথাকথিত মাযহাবটির নামকরণ ও উৎপত্তির ব্যাপারে ইসলামে বিস্তারিত ইতিহাস রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে খারেজী মাযহাবের উদ্ভাবক হল ইহুদী গোষ্ঠী। তারা মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরানোর উদ্দেশ্যে সিফফিনের যুদ্ধে ইসলামের বড় দরদী হয়ে আমীর মাবিয়ার সৈন্য দলে শামিল হয়। এ যুদ্ধ চলা কালে হযরত আলী (রাঃ) এর আরবী সৈন্য দলের মোকাবিলায় পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে প্রতারণা মূলকভাবে তারা তীরের মাথায় কোরআন শরীফ বেঁধে আর চিৎকার করতে করতে হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য দলের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করল। আর উভয়ের মধ্যে সঠিক ফয়সালা করবে ঐ কোরআন যা আমাদের তীরের মাথায় বাঁধা রয়েছে।

শামী সৈন্য দলের তীরের মাথায় আল্লাহ্ পাকের কোরআন বাঁধা দেখে হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য দল যুদ্ধ করা কোরআন অবমাননাকর কাজ মনে করেন। তাই তাঁরা হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন যে, আমরা এমতাবস্থায় যুদ্ধ চালাতে পারি না। যখন হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্য দল যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন, তার পরপরই আমীরে মাবিয়ার শামী সৈন্য

দল হযরত আলী (রাঃ) ও মাবিয়া (রাঃ) উভয়কে কাফের আখ্যায়িত করে সৈন্য দল হতে খারিজ হয়ে যায়। এমনকি হযরত আলী (রাঃ) এর ২০ হাজার সৈন্যের অনেকেই তার দল ত্যাগ করে এবং তারা সৈন্য দল হতে খারেজ হয়ে "হারুরা" তে সংঘবদ্ধ হয় তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে কাফের বলার জন্য কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করে।

হযরত আলী (রাঃ) পরবর্তীতে এই খারেজীদের সাথে যুদ্ধও করেন। সেই যুদ্ধে অধিকাংশ খারেজী মৃত্যু বরণ করেছিল। তন্মধ্যে ৯ জন খারেজী বেঁচে ছিল, তারা নিজেদের মনগড়া আকীদা নীতিমালার তবলিগ করতে থাকে তবে আজ পর্যন্ত কোন ইসলামীদল এ দলের শামিল হয়নি। কেবল মাত্র বর্তমান ওহাবী নজদী ও দেওবন্দীদল কতিপয় কাজে খারেজীদের অনুসরণ করে চলেছেন। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এদের ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে সতর্ক থাকা অপরিহার্য কর্তব্য।

নজদী প্রণীত এবং কুফরী কালাম সম্বলিত দু'টি কিতাব

১। কিতাবুত্‌তাওহীদ। ২। কাশফুশ শুবহাত।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী প্রণীত দু'টি ধর্মনাশা কিতাব রয়েছে। প্রথম কিতাবটির নাম "কিতাবুত তাওহীদ"। দ্বিতীয় কিতাবটির নাম "কাশফুশ শুবহাত"।

প্রথম আরবী পুস্তকখানার উর্দু অনুবাদ করেন মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেব। যার নাম রাখা হয় "তাকবিয়াতুল ঈমান"। কিতাবুত তাওহীদ হউক বা তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাব দু'টি কুফরী মতবাদকে পূর্ণ সমর্থ দিয়ে লেখা হয়েছে। তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাব খানার প্রচারের লক্ষ্যে সমগ্র হিন্দুস্থানে সোচ্চার হয়ে উঠে ১২ই রবিউস্‌সানী

১২৪০ হিজরীতে ইসমাইল দেহলভী সাহেব ওহাবী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দিল্লীর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক তর্ক বহছে লিপ্ত হয়। ইসমাইল সাহেব তর্কে পরাজয় বরণ করতঃ তার দু'জন সাথী মৌলভী আবদুল হাই ও মৌলভী আবদুলগণি মাহামীকে সভা মঞ্চের উপর রেখে পলায়ন করেন। অতঃপর দিশাহারা হয়ে ইসমাইল সাহেব ওহাবী মতবাদ প্রচার লক্ষ্যে আফগানিস্থানে গমন করেন। সেখানেও ইসমাইল সাহেব আফগানী ওলামাদের হাতে ধরা পড়ে বড় অপদস্ত হন। এই দু'স্থানে অপদস্ত হওয়ার পর ইসমাইল সাহেব প্রকাশ্যভাবে খারেজী মাযহাব প্রচার বন্ধ করে দেন। ইসমাইল প্রকাশিত পুস্তক খানার মধ্যে পরিস্কার ভাষায় তিনি লেখেন, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) মরে মাটি হয়ে গেছেন। (নাউজু, বিল্লাহ)

নজদী সাহেব প্রণীত কাশফুশ শুবহাত (সংশয় নিরসন)

এই পুস্তক খানার মূল প্রণেতা হলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী। একজন বাংলাদেশী সৌদী সরকারের অনুমতি ক্রমে পুস্তক খানার বঙ্গানুবাদ করে নিজকে ধন্য মনে করছেন। বঙ্গানুবাদে তিনি বলেছেন যে, ইসলাম ধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত। (১) ভেজাল যুক্ত ইসলাম (২) ভেজাল মুক্ত ইসলাম। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী দ্বিতীয় প্রকারের সংস্কারের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছেন। অর্থাৎ ভেজাল যুক্ত ইসলামকে ভেজাল মুক্ত ইসলামে পরিণত করার জন্য আল্লাহ পাক তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অনুবাদক উক্ত পুস্তকের পূর্ব ভূমিকায়ও বলেছেন যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ধর্ম সংস্কারক বা রিফর্মার ছিলেন।

অনুবাদকের বর্ণনা মতে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মে জীবিত মৃত, ইমাম ও পীর, খাজা, ওলী, দরবেশ, মাজার, দরগাহ ভূত, প্রেত ইত্যাদি এসে আল্লাহ পাকের আসনে চেপে বসেছিল। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) নিজেই এসব কুসংস্কারগুলোর উদ্ভাবক ছিলেন। কারণ তিনি কবর জিয়ারত করে কবর পূজার সূচনা করান। মানুষ ও জ্বীন জাতিকে তিনি নিজ হাতে বাইয়েত করায়ে দুনিয়ার বুকে পীর মুরীদের ছিলছিলা কায়েম করেন। এই সমস্ত কুসংস্কারকে দুনিয়ার বুক হতে নিঃশেষিত করার জন্যই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সে মনোনীত হয়।

উক্ত কুসংস্কার রহিত করণের লক্ষ্যে তিনি তার সংগ্রাম পরিচালনা করে অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যও অর্জন করেছেন। ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভ কালে যে বাইয়েতে রাসুল এবং পরে বাইয়েতে ছাহাবা প্রচলিত ছিল তারও তিনি মুলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। অথচ হুজুরে পাক (দঃ) হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত ওসমান (রাঃ) এর মৃত্যু সংবাদের প্রতিবাদে লোকদের যে বাইয়েত করান এবং মক্কা বিজয়ের সময় হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা কর্তৃক লোকজনের যে বাইয়েত করান তারও তিনি বিরোধীতা করেন। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী হুজুরে পাক (দঃ) ও ছাহাবা প্রভৃতি কিছুই মানতনা। তার একমাত্র বিশ্বাস ছিল আল্লাহ পাকের একত্বের উপর। সে মক্কা বাসীদের চিরাচরিত একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে ইসলাম ধবংসেই মেতে উঠেছিল। তার রচিত কাশ্ফুশ্ শুবুহাত পুস্তকে যে সমস্ত ইসলাম বিরোধী উক্তি সে করেছে এবং আরব বাসীর মৌলবাদের পুণঃ প্রচার করেছে। আমার অত্র ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রশ্নোত্তর আকারে করতে চেষ্টা করেছি। সহৃদয় পাঠক এ আলোচনা থেকে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ঃ আমি যে কাশ্ফুশ্ শুবহাত বইখানার আলোচনা করেছি সেই ধর্মনাশা বইখানা এম, এ, বারী কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, ১৮ নওয়াব পুর রোড ঢাকা হতে মুদ্রিত। উক্ত বইখানার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী কর্তৃক কতিপয় ধর্ম নাশা কটুক্তি

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী বঙ্গানুবাদ কাশ্ফুশ্ শুবুহাত পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর দোষারোপ করে বলেন ঃ

১। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কার নেতার কাফেরদের মূর্তি ভেঙ্গে অন্যায় কাজ করেছেন। নজদী সাহেবের নিকট মূর্তি নির্মাণ নেক কাজ রূপে গণ্য ছিল এবং মূর্তি ভাঙ্গা অপরাধে গণ্য ছিল।

২। কাফেররা ইবাদত, হজ্ব, দান খয়রাত ইত্যাদি নেক কাজ পালন করতো। বিশেষ করে তারা আল্লাহ পাককে অধিক মাত্রায় স্মরণ করতো।

৩। মুশরেকগণ সাক্ষ্য দিতো আল্লাহ পাক একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, জীবনদাতা ইত্যাদি। (কাশ্ফুশ্ শুবুহাত প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

৪। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) যে সব মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা তৌহীদ এর রুবুবিয়তে এর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। তারা আল্লাহ পাকের রুবুবিয়াত এর গুণাবলী মেনে নিয়ে ছিল। অথচ আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসুল তাদেরকে সেই তৌহীদের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। (দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পৃষ্ঠা)

৫। মুসলমানদের তুলনায় কাফেররা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু," এর অর্থ বেশী ভাল জানতো। (তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম পৃষ্ঠা)

৬। মুসলমানরা নবী, ওলী, বৃক্ষ, কবর, জ্বীন প্রভৃতিকে 'ইলাহ' এর আসনে উপবিষ্ট করেন। নবীগণ কাফেরদিগকে একথা বুঝাবার প্রয়োজন মনে করেন নি। (অষ্টম পৃষ্ঠা)

৭। কাফেররা কালেমার অর্থ বুঝে নিয়ে ছিল, কিন্তু মুসলমানগণ তাও বুঝে নিতে সক্ষম হচ্ছেনা। (নবম পৃষ্ঠা)

৮। স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ) নিজের কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করতে সক্ষম নন। আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ও অন্যান্যরাত বহু দূরের কথা। (বিশ পৃষ্ঠা)

৯। যাদের সঙ্গে হুজুরে পাক (দঃ) যুদ্ধ করেছেন, তারা আল্লাহকে ভাল করে জানতো। (বিশ পৃষ্ঠা)

এরূপ আরো অনেক কটূক্তি করে নজদী সাহেব মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর পূর্বে ইসলামী আন্দোলনকে অযৌক্তিক ও মিথ্যা ছিল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ পাকের কোরআনে ঘোষিত হুদায়বিয়ার সন্ধিকে মেনে নিতে চায় না।

আমি পাঠকগণকে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর লিখিত কিতাবের ধর্মনাশা ও বিভ্রান্তিকর কতিপয় মন্তব্য ও কটূক্তি হুবহু জানিয়ে দিলাম। এক্ষণে বাদবাকী বিচার আপনাদের নিকট। তারপরেও যদি আপনাদের সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি দূর না হয়, তার জন্য আমি নিম্নে আলোচনার মাধ্যমে আমার এবং ওলামাদের বক্তব্য পেশ করছি।

এসবের জবাব দেয়ার আগেই আমি সম্মানিত পাঠকদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ছিলেন খোদাপন্হী। তাই রাসূলে পাক (দঃ) কে কটূক্তি করতে সে কোন দ্বিধাবোধ করেনি। এমনকি মুসলমানদের উপর কাফেরদের প্রাধান্য দিয়ে ধৃষ্টতাও প্রকাশ করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে আমার এবং যুগশ্রেষ্ঠ ওলামাদের মত অনুযায়ী এবং

আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী কাফের বা বিধর্মী। কেননা আল্লাহ্ পাককে শুধু বিশ্বাস করলেই চলবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) কে বিশ্বাস না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার এবং মুসলমান হতে পারবে না। এসবের সমস্ত বক্তব্য কোরআন ও হাদীস মোতাবেক প্রমাণিত তথ্যের মাধ্যমে আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে আলোচনা করছি।

ধর্ম অবমাননার প্রতিফল।

হযরত নবী করীম (দঃ) ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দেশিত ছিলেন তৌহীদ প্রচারের জন্য নয়।

মহানবী (দঃ)-এর হস্ত লিখিত পবিত্র পত্র

بسم الله الرحمن من محمد رسول الله الى عظيم
فارس السلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله
... ... انا رسول الله الى الناس كلهم لتنذر من
كان حيا ويحق القول على الكافرين اسلم تسلم فان
توليت فعليك اثم المجوس .

বঙ্গানুবাদঃ (ইসলাম গ্রহণের চরম পত্র) পারস্য সম্রাট কায়সারের প্রতি মহানবী রাসুলে পাক (দঃ) এর হস্ত মোবারক কর্তৃক লিখিত পত্রঃ পত্র প্রেরণকারীর নাম মোহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ।

হেদায়েত গ্রহণকারী ও আল্লাহ এবং রাসূলে পাক (দঃ) এর প্রতি ঈমান গ্রহণকারী শান্তিতে থাকুন।

আমি আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল। জীবিতদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ও কাফেরদের কুফরী কর্ম ধ্বংসের জন্য আবির্ভূত হয়েছি। হে কাফেরের বংশ! ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাও! হে অগ্নি পূজক বাদশাহ! তুমি যদি আমার কথা অমান্য কর তবে, অন্যান্য অগ্নি পূজকদের পরিণাম যা হয়েছে তোমারও তাই হবে।

পত্রখানা সম্রাটের হস্তগত হওয়ার পর সম্রাট ক্রোধান্বিত হয়ে বকলো, "মোহাম্মদ" আমার প্রজা হয়ে আমার নামের উপর তার নাম লিখল। পরক্ষণেই সম্রাট পত্রখানা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললো। আর হুজুরে পাক (দঃ) এর শান বিরোধী কতেক কটূক্তি করল এবং এই পবিত্র পত্রখানার কোন উত্তরও দিল না।

ইত্যবসরে হযরত নবী করীম (দঃ) এর নিকট যখন পত্রখানা ছিড়ে ফেলার সংবাদ পেঁৗছল, তখন তিনি সম্রাটের জন্য বদদোয়া করলেন। "হে মহান আল্লাহ! যে আমার ধর্ম আহবানের পত্রখানা এভাবে ছিড়ে ফেললো তাকে এবং তার রাজত্বকে এভাবে ছিড়ে ফেলো।

ইয়েমেনের শাসন কর্তার নিকট উক্ত সম্রাট এই মর্মে পত্র লিখে যে, হেজাজ প্রদেশে নাকি একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। সে দুজন লোক মারফত আমার নিকট তার ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়ে পত্র লিখেছে। তার এই ধৃষ্টতার জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

আপনি তাকে আমার নিকট ধরে নিয়ে আসুন। ঐ মোহাম্মদ ব্যক্তি পত্র লেখার আদবটুকু পর্যন্ত শিখে নাই। সাত প্রদেশের বাদশাহর নামের উপর তার নাম লিখে বাদশাহর নামের অবমাননা করল।

অতঃপর ইয়েমেনের শাসনকর্তা "বাজান" বাদশাহর হুকুমে দু'জন বিজ্ঞ লোক "বানুইয়া" ও "খারখারা" কে এই মর্মে পত্র লিখে পাঠান যে, হে মোহাম্মদ! আপনি এই পত্রখানা পাওয়া মাত্র বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হন। উভয় পত্র বাহক উক্ত পত্রখানা সঙ্গে করে তায়েফে উপস্থিত হয়। এবং সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় রত আবু সুফিয়ানের

সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তারা আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করল মোহাম্মদ (দঃ) কোথায়? আবু সুফিয়ান উত্তর করে, সেতো মদীনায় অবস্থান করেন।

এদিকে তাদের পেয়ে আবু সুফিয়ান মনে মনে খুব খুশী হল। কেননা সে একজন সম্রাটকে তার পক্ষ হিসেবে পেল। যাহোক, পত্র বাহক দু'জন ঐ পত্র নিয়ে মদীনায় গমন করল এবং হুজুরে পাক (দঃ) এর হস্তে উক্ত পত্রখানা অর্পন করল এবং বলল আপনাকে বাদশাহর দরবারে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা নির্দেশিত। আপনি খুশী মনে আমাদের সঙ্গে চলুন। নচেৎ বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীদের সহ মদীনা ধ্বংস করে দিবেন।

হুজুরে পাক (দঃ) পত্র গ্রহণ করে ঐ দু'ব্যক্তিকে দেখে স্মিত হাস্যে বললেন, তোমরা দাঁড়ি মোচ কেন কেটেছ! তারা বললো, এটা আমাদের বাদশাহর নির্দেশ। হুজুরে পাক (দঃ) বললেন, আমার বাদশাহর নির্দেশ দাঁড়ি লম্বা করার ও মোচ ছাটার।

অতঃপর হুজুরে পাক (দঃ) পত্রবাহক দুজনকে তাঁর নিকট বসালেন। তারা বসল এবং হযরত রাসূলে পাক (দঃ)-এর সান্নিধ্যে তাদের দুজনেরই দেহ ও মনে কম্পন শুরু হয়ে গেল। তারা ভয়ে ভয়ে হযরত নবী করীম (দঃ)-কে বলল, হুজুর। আপনার সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, আপনি শুধু একখানা পত্র লিখে দিন আমরা "বাজানের" নিকট ফিরে যাই। অন্যথায় বাদশাহ আমাদেরকে দেরী করার দরুন কতল করে ফেলবে।

হুজুরে পাক (দঃ) বললেন, আজ তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি দেখি, যিনি দোজাহানের বাদশাহ তিনি আমাকে কি নির্দেশ দান করেন।

পরদিন পত্র বাহক দুজনকে ডেকে হুজুরে পাক (দঃ) বললেন, তোমাদের বাদশাহ আজ নিহত হয়েছেন, নিজ পুত্রই তাকে হত্যা করেছে।

তোমরা বাজানকে বলো, সে যদি দ্বীনে ইসলামে দীক্ষিত হয় তবে তাকে পারস্যের বাদশাহী দান করা হবে। আর এর অন্যথা করলে বাদশাহর অনুরূপ পরিণাম তারও ভাগ্যে ঘটবে।

পত্রবাহক দু'জন হুজুরে পাক (দঃ)-এর সান্নিধ্য ত্যাগ করে বাজানের নিকট গিয়ে অনুসার্বিক সব ঘটনা বর্ণনা করলে বাজান স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং বললো, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর নবী।

শেষ পর্যন্ত ইয়ামনের শাসনকর্তা (বাজান) নবী পাকের নির্দেশের মর্যাদা বহন করে সাত প্রদেশের সম্রাট হয়েছিল।

পারস্য সম্রাট কেস্‌রার নিকট হুজুরে পাক (দঃ) যেরূপ ভয় ভীতি পরিহার করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার চরম পত্র দিয়েছিলেন, অনুরূপ চরম পত্র নিম্নলিখিত বাদশাহগণের নিকটও প্রেরণ করেছিলেন। চরম পত্রগুলো নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله صلى الله
عليه وسلم الى كسرى - اما بعد تعالوا الى كلمة سواء
بيننا وبينكم ... الى قوله تعالى بانا مسلمون -

"হে কায়সার, হে কেস্‌রা, হে নাজ্জাসী" এই পত্রখানা আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট হতে প্রেরিত হয়েছে। তোমরা সকলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাও। অন্যথায় তোমাদের পরিণামও তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ হবে।

এই ইসলামী দাওয়াতের চরম পত্রখানা যখন পারস্য সম্রাটের হস্তগত হয়, তখন সে পত্রখানা না পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছিল। এদিকে হুজুর (দঃ) অদৃশ্য জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তাঁর পত্রখানার অবমাননা করা হয়েছে, তখন তিনি তার প্রতি বদদোয়া করলেন, "যে আমার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে যেন ধ্বংস হয়ে যায়"। হুজুরে পাক (দঃ) এর এই অভিশাপের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

অনুরূপ একখানা পত্র কায়সারের নিকট গিয়ে পৌঁছার পর সে পত্রখানাকে যথাসম্ভব সম্মান দিয়েছিলেন এবং ঐ পত্রটিকে তিনি সযত্নে তার সিন্দুকের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। যদিও তিনি তার প্রজা সাধারণের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন নি কিন্তু হুজুরে পাক (দঃ) এর এই পত্রখানাকে শুধু সম্মান দেওয়ার বদৌলতে তার রাজত্ব ঠিক রয়েছিল। এমন কি তার বংশধরগণও অনেক দিন ধরে রাজত্ব করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে হুজুরে পাক (দঃ) ও এরূপই দোয়া করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "এক বিশেষ সময় পর্যন্ত কায়সারের অধঃপতন পর কাইজান বংশ রাজত্ব করে যাবে।" আল্লাহ পাকের নবীর দোয়া বিফলে যায়নি। এই কারণেই আজ পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সারা বিশ্বে খৃষ্টানদের রাজত্ব চলছে।

বাদশাহ নাজ্জাশী যখন অনুরূপ পত্র পেলেন, তিনিও খুব যত্নের সঙ্গে পত্রের মর্ম উদ্ধার করে ইসলামের দাওয়াত কবুল করলেন। বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেছেন। ঈমানের সাথে যথা সময়ে তাঁর মৃত্যু হলে হুজুরে পাক (দঃ) মদীনায় থেকেই তা অদৃশ্য জ্ঞানের বলে জানতে পারেন এবং তাঁর জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েন।

মহানবী (দঃ) কর্তৃক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আর একখানা পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد بن عبد الله
ورسوله الى المقوقس عظيم القبط - السلام على من اتبع
الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام -
اسلم تسلم ... ...

বঙ্গানুবাদঃ আল্লাহ পাকের রাসুল মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর পক্ষ হতে সম্রাট মাকুকাসের নিকট প্রেরিত হল ঃ

শান্তি বর্ষিত হোক, ঐ ব্যক্তির উপর যে আমার আহবানে সাড়া দিবে আমি তোমাদিগকে ইসলাম এর দিকে আহবান করছি। তোমরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হও, শান্তি পাবে। আর তার বিপরীত করলে তোমাদের পরিণতি তোমাদের পূর্ব পুরুষ কিবতী কাওমদের মত হবে। মাদারেজে নবুয়ত গ্রন্থে লিখেছে যে, হুজুরে পাক (দঃ) হাতেব (রাঃ)-কে নিজ হস্তে লিখিত পত্রসহ সম্রাটের নিকট পাঠান। পত্রখানা সম্রাটের হস্তগত হওয়ার পর তিনি এর যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং হুজুরে পাক (দঃ)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা পত্র বাহকের সঙ্গে আলোচনা করে বলেন, ইনিতো সেই নবী, যাঁর সংবাদ পূর্ববর্তী নবী হযরত ঈসা (আঃ) বিশ্ব মানবের কাছে রেখে গেছেন।

তখন পত্রবাহক বললো, বাদশাহ নামদার আপনি পত্রখানার সম্মান করলেন অথচ আপনার এই দেশেই পূর্বকালে জনৈক বাদশাহ নিজেই খোদায়ী দাবী করেছিল।

উত্তরে বাদশাহ বললেন, বিশ্ব মানবের জন্য আদিকাল থেকে একটি বিশেষ ধর্ম রয়েছে। আমি চাই সেই প্রকৃত ধর্মের সুশীতল ছায়া তলে নশ্বর জীবন অতিবাহিত করি। তবে ইসলাম ধর্ম সমুন্নত। তখন পত্র বাহক বললো, জনাব আপনি অতি মহান এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে হুজুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আপনি একখানা পত্র লিখুন। যা আপনার একথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা হুজুরে পাক (দঃ) এর দরবারে পেশ করতে পারি।

আমি কিবতী বংশের, মিশরের বাদশাহ আল্লাহ পাকের রাসুল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করলাম।

আপনি যে বাহক মারফত একখানা পত্র প্রেরণ করেছেন, তা আমি সুস্থ মস্তিষ্কে পাঠ করেছি ও এর মর্ম অনুধাবন করেছি। এবং আপনার পত্র বাহককেও সাধ্যমত সম্মান করেছি। আর আপনার জন্য দু'টি বাঁদী ও একটি খচ্চর উপঢৌকন পাঠালাম। পত্রবাহক পত্রসহ হুজুরে পাক (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হল এবং হুজুরে পাক (দঃ)-তার দেওয়া উপঢৌকন গ্রহণ করলেন কিন্তু সাথে সাথে মিশরের বাদশাহর জন্য বদদোয়াও করলেন। এক নির্দিষ্ট সময় হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগে মিশরের রাজত্বসহ বাদশাহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়।

রোম সম্রাট হিরাকলিয়াসের সঙ্গে মহানবী হুজুরে পাক (দঃ)-এর পত্রালাপের কারণ

মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) কে মক্কা হতে বের করে দেয়ার পর তিনি মদীনায় পদার্পন করে সেখানে গঠন করেন বিরাট মুসলিম সংগঠন। সাংগঠনিক রূপে প্রিয় নবীর প্রধান কাজছিল ইসলামী আন্দোলন। ইসলাম প্রচারের খাতিরে তিনি স্বহস্তে পরিচালনা করেন বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান। বদর ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর হতে মক্কার কাফেরগণ প্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সাহায্যের জন্য তারা বিভিন্ন দেশে পদার্পণ করে। অন্যদিকে মুসলমানদের সহায়ক ও সাহায্যকারী ছিলেন শুধুমাত্র আল্লাহ পাক। কুফ্ফারে মক্কার পক্ষে খ্যাতি সম্পন্ন আরব দলপতি আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার সাহায্যার্থে গমন করেছিল 'গাজওয়ান' শহরে। সে সময় মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) প্রেরণ করেছিলেন রোমের সম্রাট হিরাকলিয়াসের নিকট একখানা ইসলামী দাওয়াত পত্র। এ পবিত্র ইসলামী দাওয়াতে সকলের সঠিক রূপ রেখা আমি বর্ণনা করছি বোখারী

শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসের মাধ্যমে। এই পবিত্র হাদীস গ্রন্থে রোম সম্রাটের সঙ্গে প্রিয় নবী হুজুর (দঃ) এর যে পত্রালাপ হয় তা আমি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

রোম সম্রাটের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত

মহানবী (দঃ)-এর পত্র ঃ প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) মক্কার ভূমিত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করার পরপরই কয়েকটি বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যুদ্ধচলমান অবস্থায় প্রিয় নবী বিভিন্ন স্থানে কখনো কখনো সাহাবা মোবাল্লিগ প্রেরণ করছিলেন। যেমন প্রেরণ করেছিলেন "নজদের নেতা আবুত তোফায়েলের নিকট। তেমনি তিনি অন্য দিকে শুরু করেন সম্রাট, রাজা, বাদশাহদের নিকট পত্রপ্রেরণ। যেমনঃ রোমের সম্রাট "হিরাকলিস" এর নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন সেই পত্রের শিরোনামে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) লিখেছিলেন ঃ اسلم تسلم। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাও তাতে শান্তি নিহিত রয়েছে। পত্র বাহক পত্রখানা সম্রাটের হাতে তুলে দেয়ার পর সম্রাট ভীত হয়ে স্বশরীরে কাঁপতে থাকে। সম্রাট উপস্থিত দরবারীদের মধ্যে ঘোষণা দেন যে, যেভাবে হউক এবং যেখান থেকে হউক একজন আরবী ভাষীকে আমার দরবারে উপস্থিত কর। এই ঘোষণা দিয়ে সম্রাট প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর প্রেরিত পবিত্র পত্র খানাকে স্বসম্মানে সংরক্ষণ করেন। দরবারীগণ বহু স্থানে তালাসী দিয়ে কোন আরবভাষীকে পেলো না। তবে একজন দরবারী খোজতে খোজতে "গাজওয়ান" শহরে পেঁছিল। সেখানে সে বনিক দলের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকারী এবং আরব বিখ্যাত নেতা আবুসু-

ফিয়ানকে পেল। আবুসুফিয়ান আরবী ভাষা ভাল জানিতেন। সম্রাটের প্রেরিত ব্যক্তি আবুসুফিয়ানকে বলল, আমার সঙ্গে সম্রাটের দরবারে চল। আবুসুফিয়ান আত্মহারা হয়ে বলল, আমি নিরপরাধ মানুষ, আমি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এখানে আগমণ করেছি। কিন্তু সম্রাটের প্রেরিত লোক তাকে হাত ছাড়া করলো না অর্থাৎ সঙ্গে করে আবুসুফিয়ানকে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত করলো। আরব নেতা আবুসুফিয়ান করজোড় হয়ে বলল যে, আমি নিরপরাধ মানুষ, এ শহরে অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। কারণ আমাদের মধ্যে হতে মোহাম্মদ নাম্মী একজন আরবীয়ান ইসলাম নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রচারে লিপ্ত রয়েছে এবং আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত আছি। কয়েকটি যুদ্ধে তাঁর সহচরগণ আমাদের যোদ্ধাগণকে হত্যা করে তাঁর তরবারী পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন আমাদের যুদ্ধ পরিচালনা অচল হয়ে পড়েছে। হে সম্রাট! আমি গজওয়ান শহরে যুদ্ধ অর্থ যোগানের জন্য উপস্থিত হয়েছি। এছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। হে সম্রাট! আপনি আমাকে অপদস্ত করবেন না এ আমার শেষ অনুরোধ।

সম্রাট আবুসুফিয়ানের বক্তব্য শুনে বললেন। তুমি নিরপরাধী, তোমাকে অপদস্ত করার জন্য উপস্থিত করাইনি। বরং তোমাদের আরবের একজন মোহাম্মদ নামের লোক আমার নিকট পত্র প্রেরণ করেছেন, তাঁকে তুমি চিন? আবুসুফিয়ান বলে উঠলো মোহাম্মদকে চিনবনা কেন সেতো আমার নিকটতম আত্মীয়, তাঁর ইসলামী ধর্মমতের বিরুদ্ধে আমরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করছি। সম্রাট বললেন, তোমার সেই আত্মীয়তো আমার নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেছেন যা এখনও আমি পাঠ করিনি। তবে পত্রখানা হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেছে! হে আবুসুফিয়ান! মোহাম্মদ (দঃ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে পার? আবুসুফিয়ান প্রথম পরিচিতিতে বলল, মোহাম্মদ (দঃ) আমার আত্মীয়, সে ইসলাম নামের একটি নতুন ধর্মমত প্রচার করতেছে,

আমরা তাঁর ধর্ম মেনে নিতে পারছিনা। সম্রাট বলল, কেন তাঁর ধর্ম মেনে নিতে পারছনা? আবুসুফিয়ান বলল, আল্লাহর "এলাহ বাদ" থাকতে মোহাম্মাদ (দঃ) এর "ইসলাম"কে মেনে নেয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনা।

সম্রাট পুনঃ প্রশ্ন করলেন, মোহাম্মাদ এর চরিত্র কেমন? প্রতি উত্তরে আবুসুফিয়ান বলল, মোহাম্মদ (দঃ) যদিও গরীব কিন্তু বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে আরবের সকল বংশ হতে তাঁর বংশ অত্যান্ত উচ্চ। তাঁর দাদার হাতে আল্লাহর ঘরের চাবি ছিল। যতজনে যাই বলুকনাকেন, মোহাম্মদ (দঃ) এর মধ্যে কতিপয় বিশেষ গুণ রয়েছে। সে বাল্য বেলা হতে মিথ্যে বলে না। কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা সে সমগ্র আরবের মধ্যে একক বিশ্বস্থ সত্বা।

আবু সুফিয়ানের বক্তব্য শুনার পর সম্রাট রাজদরবারের সামনে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর প্রেরিত পত্রখানা খুলতে নির্দেশ দিলেন। পত্র পাঠের পর দরবারীগণের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। সে সময় পত্র বাহক চিৎকার দিয়ে ঘোষনা দিল যে, পত্র প্রেরক অর্থাৎ মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) সাফল্য লাভ করেছেন। রোম সম্রাট পত্রখানা পড়ার পর স্ব-সম্মানে উহাকে সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষণ করেন। যতদিন এই পবিত্র পত্রখানা সিন্দুকে সংরক্ষিত ছিল ততদিন সম্রাটের আত্মীয়দের মধ্যে বাদশাহী সীমিত ছিল।

পাঠক ঃ আমি এখানে আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটি কথা বলতে চাই যে, প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) এর প্রেরিত পত্রের শিরোনাম বিষয় ছিল কি? বাদ্যগতভাবে বলতে হবে তিনি রাজা বাদশাহর নিকট ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। দীনে এলাহী বা আল্লাহর প্রভুত্ব ও একত্ববাদ প্রচার করেননি। কারণ আল্লাহ পাকের মনোনিত ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর কাফের কর্তৃক "দীনে এলাহী" নামের ধর্ম রহিত হয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী শুধু খোদা বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সে কুফরী আকীদার বিশ্বাসী হয়ে আরব ভূখন্ডের কুখ্যাত চিহ্নিত

কাফেরদের কুফরী কর্মের সমর্থ দিয়ে বলেন ঃ কাফেরগণ আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণ করতো দান খয়রাত করতো তারা তাওহীদে রবুবিয়াতের পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ পাকের রাসূল শত্রুতা করে তাদেরকে একত্ববাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। প্রকৃত পক্ষে নজদী সাহেব হযরত মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহের খোদা প্রদত্ত নবুয়ত ও রেসালাতের মোটেই বিশ্বাসী ছিল না। মক্কার কাফেরদের কুকর্ম কুপ্রথার সমর্থন দিয়ে সেও কাফের দলের অন্তর্ভুক্ত হল।

আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও রবুবিয়াতের স্বীকার উক্তি প্রত্যেক নেক ও বদ সকলেই রোজে আজলেই الست بربكم قالوا بلى। বাক্যের মধ্যে করেছে। এখন আর আল্লাহ পাকের একত্ববাদ প্রচার করার আদৌ প্রয়োজন নেই। তবে এখন শুধু একত্ববাদের বিশ্বাসী হওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহর মনোনিত ইসলাম ধর্মের প্রচার ও তাবলীগ প্রতেকেরই ফরজ কাজ রূপে নির্ধারিত। ইবলিশ শয়তান ও আল্লাহ পাককে এক বলে বিশ্বাস করতো তার পরও ইবলিশকে আল্লাহ পাক কাফের নামে আখ্যায়িত করেন। ইবলিশ কখনও মুশরিক ছিলনা। তবে ইবলিশ হযরত আদম (আঃ) এর নবুয়তের অবিশ্বাসী হয়ে কাফেরে পরিনত হয়। আল্লাহ পাকের একত্ববাদের পরিচিতি লাভ হয় নবুয়তের আয়নাতে। যদি নবীই না হয় তবে আল্লাহ পাকের পরিচিতি লাভ হবে কোথা হতে। কোরআন মজিদ প্রিয় নবীর আগমনের বহু পূর্বে লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। আমরা এই কোরআনের সন্ধান পেয়েছি হযরত মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহের মাধ্যমে। আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও রবুবিয়াতের বিশ্বাস করা কোন দীন ও ধর্ম নয়। কারণ আল্লাহ পাকের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই। যারা খোদা বিশ্বাসকে ধর্ম রূপে মেনে নিয়েছে ইহা তাদের মনগড়া ধর্ম। এই মনগড়া ধর্ম পালনের দ্বারা দোযখে যাবে। বেহেশতে যাওয়ার একমাত্র সুপথ হল নবী পাকের আনিত ইসলাম ধর্ম পালনের মধ্যে।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ধর্মনাশা কটুক্তির জবাব এবং মৌলবাদের জন্ম কথা।

(১) **ইসলাম ঃ** হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মের নাম ইসলাম। এ ধর্মটি আরব ভূখণ্ডের বুক চিরে বিশ্ব জগতে বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে সে আরবে দীনে তাওহীদ বা দীনে এলাহী নামের ধর্ম মতের প্রচলন ছিল। যখন আরবের বুকে ইসলাম ধর্মের সূচনা হয় তখনি "দীনে এলাহী" চিরতরের জন্য বিদায় নেয়। যখন প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক ইসলাম প্রচারের জন্য নির্দেশিত হয়ে সর্ব প্রথম তিনি মক্কার কাফেরদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহবান করেন তখন কতিপয় কাফের প্রিয় নবীকে "দীনে এলাহী'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহবান জানায়। এ আহবানের জবাবে হযরত নবী করীম (দঃ) কাফেরদের এই উত্তর দিলেন لكم دينكم ولى دين তোমাদের জন্য তোমাদের পূর্ব ধর্মমত এবং আমি আমার ধর্মের উপর আছি। তাফসীরে কুরতুবীর গ্রন্থকার বলেন ঃ তোমরা নিজ ধর্ম মতে থেকে হুজুরে পাক (দঃ) এর এ নির্দেশটি পরবর্তিকালে জেহাদের নির্দেশিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এখন শুধু, 'দীনি ইসলাম' মেনে চলতে হবে।

উপরে উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, 'দীনে এলাহী' কাফেরদের জন্য ধর্মমত ছিল বিশেষ যুগ পর্যন্ত। এ ধর্মমতের পরিবর্তে পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিল ইসলাম ধর্ম। দীনে এলাহীর ধর্মমতটি আরবের বুকে সামান্য কিছুদিন প্রচলিত ছিল। পরবর্তিতে দীনে এলাহীর পরিবর্তে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রিয় নবী নির্দেশিত

হন। আল্লাহ তাঁকে এমন কড়া নির্দেশের মাধ্যমে বললেন ঃ কাফের মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। এই নির্দেশ পালন কল্পে প্রিয় নবী (দঃ) কুফরী মতবাদকে রহিত করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনাও করেন। তাঁর এ যুদ্ধাভিযানের সমাপ্তি ঘটে মক্কা বিজয়ের পর। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ নবীকে নির্দেশ দিলেন যে, ইসলাম ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই, এখন হতে ইসলাম আদর্শের মাধ্যমে প্রচার করা হোক। আল্লাহ ইসলাম পন্থীগণকে নির্দেশ দেন যে, ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম আমার নিকট গৃহিত নয়, তাই তোমরা ইসলাম ধর্মের উপর স্থির থেকে মৃত্যু বরণ কর। ধর্মমত হিসেবে ইহাই একমাত্র নাজাতের পথ। কাফের মতবাদীগণ আমার একত্ববাদে অংশীবাদ সামিল করে বিনষ্ট করেছে। হে নবী! আপনি নিজ মুখে ঘোষণা দিন যে, আমি এক, আমার কোন অংশীদার নেই। আমাকে কেহ জন্ম দেয়নি এবং আমিও কাউকে জন্ম দেইনি। শেষ পর্যন্ত ইসলামী সংগ্রামের মাধ্যমে কাফেরদের দীনে এলাহীর পরিবর্তে ইসলাম ধর্ম কায়েম হল। বিশ্ব জগতে এখন কেহ যদি বলে আমি পূর্ব প্রচলিত দীনে এলাহীর বিশ্বাসী হয়ে থাকবো এবং আমি ইসলামকে মানব না। এরূপ দাবীদারের দাবী আল্লাহ পাকের নিকট গ্রহণীয় হবেনা। কারণ ইসলাম ধর্মের সূচনা হবার পর পূর্বকার সকল ধর্মমত রহিত হয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী মক্কার কাফের মুশরিকদের দীনে এলাহী মতাদর্শের সমর্থন দিয়ে কাফেরে পরিণত হল। নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর বিশ্বাসী ছিল, তবে তার এই বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাসের সামিল নয় বিধায় মুসলিম উম্মাহর ঐকামতে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী কাফের ও মুশরিক এবং মৌলবাদের উদ্ভাবক ছিল। যদি নুজদীকে মুসলমান বলা হয় তবে বৌদ্ধ, হিন্দু ও অগ্নিপূজক সকলকে মুসলমান বলা উচিৎ। কারণ এরাও সকলে আল্লাহর বিশ্বাসী ছিল এবং আছে।

একটি ঘটনা ঃ হযরত আবু জাফর মোহাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একদা একজন দীনে এলাহী পন্থী ওয়ায়েজ কুফার মসজিদে ওয়াজ করছিলেন। কোরআনের আয়াত يدخلون فى دين الله অর্থাৎ সকলেই আল্লাহ পাকের দীনের অন্তর্ভুক্ত হও। তার ওয়াজের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কোথাও নবী পাকের কথা ছিলনা। সে শুধু আল্লাহ পাকের ভয় দেখায়ে সমস্ত উপস্থিত জনতাকে খোদাপন্থী বানাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ হযরত আলী (রাঃ) কুফার মসজিদে উপস্থিত হয়ে জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওয়ায়েজ সাহেব কে ? জনতা বলল, আমরা তাকে চিনি না, তবে তিনি অশ্রু ঝরানো ওয়াজ করছেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ এই ব্যক্তিকে ঘাড় ধরে মসজিদ হতে বের করে দাও। যেহেতু তার আকীদা বিশ্বাস খারাপ। তাকে বের করার পূর্বে ইসলামী শরীয়তের একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা কর। উপস্থিত জনতা ওয়ায়েজ সাহেবকে জিজ্ঞাস করল ঃ কোরআনের আয়াতের নাসেখ মানসুখের বিধান কি ? ওয়ায়েজ সাহেব বললেন ঃ এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। অতঃপর তাকে ঘাড় ধরে কুফার মসজিদ হতে বের করে দেয়া হল। (তাঃ আজিজ)

পাঠকবৃন্দ ঃ আমাদের এতদ্দেশের মসজিদ সমূহ আজ ইলিয়াসী পন্থীদের পূর্ণ দখলে। জমাতে নামাজ শেষে ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে একজন লোক দাঁড়ায়ে বলে ঃ দীনী ভায়েরা। নামাজ পর একটু বসবেন, দীনের তালীম হবে। মুসল্লীগন সুন্নত নফল শেষ করার আগেই একজন দীনীভাই দাঁড়ায়ে "তাবলিগী নেসাব" খানা তাদের নিকট যাহা কোরআনের সমান মর্যাদা রাখে হাতে ধরে একটানা পাঠ করতে থাকে। এই দলের অবস্থা আর কুফার মসজিদের ওয়ায়েজের অবস্থা একই। তারা আল্লাহর অত্যন্ত দরদী হয়ে শুধু দীনে এলাহী কায়েম করতে চায়। তাদের আলোচনায় মদীনার ইসলাম মোটেই স্থান পায়না।

ধর্মদ্রোহিতা ঃ ইসলামের পূর্ণ বিজয় সূচীত হওয়া পর্যন্ত অন্তত আট বছর মক্কার কাফেরগণ ইসলাম ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিল। তাদের বড় নেতা আবু সুফিয়ান এর নেতৃত্বে কাফেরগণ মহানবী হুজুর (দঃ) এর ইসলামী নীতিমালার বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে উপনীত হয়েছিল। মদীনার ধর্মপ্রাণ সামান্য বাহিনী মক্কার বিশাল কাফের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকিয়ে থাকা আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া আর কিছু ছিলনা। মক্কা বিজয় কালে এই বিশাল বাহিনীর প্রধান আরব নেতা আবু সুফিয়ান মহানবীর চাচার হাতে ধরা পড়ে আত্ম সমর্পন করলো। তারপর হতে শুরু হল ইসলামের পূর্ণজয় সূচী। আবু সুফিয়ানের আত্ম সমর্পনের পর হতে ইসলাম বিরোধী আন্দোলন চির তরের জন্য বিদায় নেয়। মক্কার চতুর্দিকের মানুষেরা ইসলামী আদর্শে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় মক্কার আঙ্গিনায় দলে দলে উপস্থিত হতে থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عن عكرمه ومقاتل : ورد من اليمن سبعمائة انسان
مؤمنين طائفة من بعضهم يؤذنون وبعضهم يقرؤن
القران ، وبعضهم يهللون ۔

অর্থাৎ ইয়ামন প্রদেশের সাত শত লোকের একটি সঙ্ঘবদ্ধ দল বিচ্ছিন্ন ভাবে মহানবী (দঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়। উপস্থিতকালে তাদের কারো মুখে উচ্চারিত ছিল আজানের বাক্য। আর কেউ কেউ কোরআনের আয়াত পাঠ করতে করতে মহানবী (দঃ) এর আস্তানায় উপস্থিত হয় আর কারো মুখে আল্লাহু আকবার ও ইয়া রাসুলাল্লাহ ধ্বনি উচ্চারিত ছিল। হযরত নবী করীম (দঃ) তাদের সকলকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের বাইয়াত করান।

আল্লাহ পাক মহানবীর এ আন্দোলনকে ইসলামী আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ধর্মদ্রোহী নজদী পন্থী ও এযুগের তাবলিগীগণ প্রিয়নবীর ইসলামী আন্দোলনকে তাওহীদী আন্দোলন নামে আখ্যায়িত

করেন। অর্থাৎ নবী করীম (দঃ) নাকি আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলেন। তারা এই অপঅর্থ করে শুধু খোদা বিশ্বাসকে ঈমান বলতে থাকে। তারা মক্কা বিজয় কালের ঘটনাকে উপলক্ষ করে বলে যে, এ সময় মানুষ শুধু খোদা পন্থী ছিল। তাদের ভাষ্যে ইসলামের দ্বিতীয় নাম দীনে এলাহী। দুনিয়ারবুকে মৌলবাদের জন্মদাতা হল নজদী পন্থী তাবলিগী দল। ইসলাম ধর্মে মৌলবাদের স্থান মোটেই নেই, যার প্রামাণ্য দলিল হল হযরত আলী (রাঃ) এক মৌলবাদী ওয়ায়েজকে কুফার মসজিদ হতে ঘাড় ধরে বের করে দেন।

পাঠকবৃন্দ ঃ আপনাদের প্রত্যেকের জানা আছে যে, সম্রাট আকবর বেদীন কাফের মহিলা বিবাহ করার সুবিধার্থে "দীনে এলাহী" নামে একটি মৌলবাদী নতুন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করতে চেয়েছিল। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে সম্রাট আকবরের "দীনে এলাহী" বা "মৌলবাদ"কে চিরতরের জন্য ভেঙ্গে দেন। তিনি বলেন যে, আমাদের মধ্যে মদীনার ইসলাম ধর্ম বিদ্যমান থাকতে শুধু খোদা বিশ্বাসীদের দীনে এলাহী নামের নতুন মতবাদের আদৌ প্রয়োজন নেই।

এতদ্দেশের ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানগণ আজ ওহাবী তাবলিগী ফের্কার খপ্পরে পড়ে ঈমান আকীদা বিনষ্ট করছে। তারা তাবলীগের ছত্রছায়ায় মদীনার ইসলামের বিরুদ্ধে দীনে এলাহীর দাওয়াত দিচ্ছে। তারা নবীর নাম উচ্চারণ না করে তাদের মুরব্বিদের নামের উপমা দিতেছে। দীনে এলাহীর দাওয়াত দেয়ার সুবিধার্থে মানুষকে দীনী ভাই নামে ডাকেন। তাদের ঈমান হল শুধু আল্লাহর উপর বিশ্বাস। তবে সঠিক ঈমানের সংজ্ঞার সাথে তাদের ঈমানের আদৌ মিল নেই। প্রকৃত ঈমান হল আল্লাহর উপর বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রিয় নবী মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (দঃ)-কে সমভাবে বিশ্বাস করা। আল্লাহ পাকের বিশ্বাস ঈমানের সুচনা।

আর নবী পাকের বিশ্বাস ঈমানের পরিপূরক। আল্লাহ পাকের তওহীদ শুদ্ধ বিশ্বাসের জন্য, আর নবী পাকের বিশ্বাস ইসলাম ধর্ম পালনের মধ্যে নিহিত। শুধু আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কুফরী কর্ম এবং দোযখের পথ।

কোরআন হাদীসের আলোকে মুসলমান ধর্মপন্থী এবং কাফের খোদা পন্থীর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী একজন অদ্বিতীয় সেরা ধর্ম নাস্তিক ছিল। সে মক্কার অন্যান্য চিহ্নিত কাফেরদের মত ইসলাম ধর্মের সমালোচনায় কুৎসা রটনায় বিভোর থাকত। তার বড় দাবী ছিল যে, সে খোদার বিশ্বাসী তাই সে কখনো হুজুরে পাক (দঃ)-এর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের একেবারে তোয়াক্কা করতো না। তাই সে ইসলাম পরিত্যাগ করে কুফরী মতবাদের বিশ্বাসী হয়ে যায়। মুসলমানদের ধর্মীয় কর্মকে কুফরী কর্মের উপর প্রাধান্য দেয়। কাশফুশ শুবহাত নামক নজদী পুস্তকে পরিস্কার ভাষায় সে বলেছে যে, আল্লাহর একত্ববাদ ও রবুবিয়াতকে কাফেরেরা যতটুকু বুঝে নিয়েছিল তা মুসলমানেরা বুঝে নিতে পারে নি। তার বর্ণিত কিতাব খানার ভাষ্যে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী শুধু খোদার বিশ্বাসী ছিল। নবীর বিশ্বাসী ছিলনা।

আমি এবার ধর্ম পন্থী ও খোদা পন্থীর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য দেখাব। প্রথমে আমি জিজ্ঞাসা করবো যে, এ দুনিয়াতে যে লক্ষ লক্ষ আম্বিয়ায়ে কেরামগণের আগমন ঘটেছিল, তা কোন লক্ষ্যে ছিল। তাঁরাকি আল্লাহ পাকের প্রভুত্ব ও একত্ব বিকাশের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, না ধর্ম প্রচারের জন্য।

ধর্ম ও তাওহীদের পার্থক্য

ইসলামের ইতিহাস ও সমস্ত আসমানী কিতাবই পূর্ণসাক্ষী রয়েছে যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামদের দুনিয়াতে শুভাগমণের মূল লক্ষ্য ছিল স্ব–স্ব ধর্ম প্রচার। যেমন হযরত মূসা (আঃ) দীনে মূ ভীর প্রবর্তক হয়ে স্ব-ধর্মই প্রচার করেন। হযরত ঈসা (আঃ) দীনে ঈসায়ীর প্রচারক ছিলেন। তদ্রূপ প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হয়ে শুধু ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি কখনো আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা রবুবিয়াত বিস্তারে আত্ম নিয়োগ করেন নি। ইসলাম ধর্মের সূচনা কালেও পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলকে নির্দেশ দেন শুধু ইসলামের নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাই প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) কুফরী মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন যুদ্ধে উপনীত হন। যখন ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ চলছিল তখন মক্কার বুকে আল্লাহ পাকের তওহীদ প্রতিষ্ঠা ছিল। যদি আল্লাহবাদই ধর্ম হত, তবে তিনি ইসলামকে কায়েম করার নির্দেশ দিলেন কেন? এ কথার সঠিক উত্তর হল যে, কাবা শরীফের হজ্ব ও তওয়াফ পালন এবং কাফেরদের সমাজ সেবামূলক সকল প্রকারের ভাল মন্দ কাজ হতে আল্লাহ পাক অত্যন্ত নারাজ ছিলেন। কারণ ঐসব কাজ ইসলাম ধর্মের নীতিমালা মোতাবেক পালন করা হতনা। যে

সব কাজ ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থী রূপে পালিত হয় তা আল্লাহর নিকট গৃহিত হয় না। তাই মুসলমানগণ প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অতঃপর ইসলামী নীতিমালা অনুসারে এবাদত বন্দেগী হজ্ব রোজা ইত্যাদি বিভিন্ন নেককাজ যথারীতি রূপে পালন করেন। সেক্ষেত্রে মক্কার কাফেরেরা ইসলাম গ্রহণ করলনা তারা নিজ প্রবর্তিত কুফরী মতবাদ পালন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ইসলামী নীতির বিপক্ষে কুফরী নীতি সমর্থন নিয়ে কুফরী মতবাদী হল।

মৌখিক ধর্ম প্রচার ক্ষেত্রে হাবীবে খোদা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবিক সর্বপ্রথম নিজ চাচা আবু লাহাবকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহবান জানান। আবু লাহাব ইসলামী আহবানকে এ অজুহাত পেশ করে প্রত্যাখান করলো যে, আমিতো প্রথম হতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিশ্বাসী হয়ে হজ্ব, তওয়াফ, সায়ী পালন করে আসতেছি এবং দারুন নদভা কমিউনিটি সেন্টারের সদস্য হিসেবে আমার অনেক নেক কাজের ও সমাজ সেবার অবদান রয়েছে। এমতবস্থায় মোহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। আল্লাহ পাক তার কুফরী যুক্তির প্রতিবাদ করতঃ সূরা লাহাব নাজিল করে আবুলাহাবকে দোযখী ঘোষণা দেন। এখন প্রশ্ন হল আবুলাহাব হজ্ব তওয়াফ ও সায়ী পালন করা সত্ত্বেও তাকে দোযখী বলা হল কেন? সেওতো আল্লাহ পাকের রবুবিয়াত ও একত্ববাদের বিশ্বাসী ছিল। একত্ববাদের বিশ্বাসের দ্বারা পরকালের নাজাত পাওয়া যায় না। তবে মুক্তির একমাত্র পথ হল হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ও আনিত ইসলাম ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্যে।

ধর্ম পন্থী ও খোদা পন্থীর পার্থক্য

সূরা লাহাবের অনুরূপ সূরা আসরের মধ্যে তাফসীরে কুরতুবীর গ্রন্থকার ধর্ম পন্থী ও খোদা পন্থীর দৃষ্টান্ত মূলক পার্থক্য বর্ণনা করেছেন: এই সূরার প্রথম আয়াতের والعصر ان الانسان لفی خسر এর মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ পাক যুগ জামানার কছম করে বলেন যে, কতিপয় খোদাপন্থী মানুষ পরকালে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাফসীর গ্রন্থকার এই খোদাপন্থীদের নাম যথাক্রমে এই বলেন: ১। আবু জেহেল। ২। অলীদ বিন মোগীরা। ৩। আস বিন ওয়ায়েল এবং ৪। আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আসওয়াদ (নবীর চাচা)।

এরা চারজন চরম পন্থী চিহ্নিত কাফের ছিল। তবে তারা আল্লাহর রবুবিয়াত ও একত্ববাদে বিশ্বাসীও ছিল। তারা খোদাপন্থী হয়ে হজ্ব তওয়াফ ও সাফা মারওয়াহ এর মধ্যে দৌড়াদৌড়ী করতো এছাড়া তারা দারুন নদওয়ার কমিটি সদস্য হিসেবে অনেক অনেক সামাজিক নেক কাজও করেছিল। তবে তারা সকল মৌলবাদী ছিল। এ দলের বিপক্ষে নিম্ন চারজন লোক ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁদের নাম যথাক্রমে এই:

১। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) যিনি ইসলামী জগতের প্রথম মুসলমান। তিনিই অন্ধ বিশ্বাসে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর ধর্মকে বিশ্বাস করে ঈমান এনেছিলেন।

২। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তিনি মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) এর ধর্মের উপর ঈমান আনার পর অনেক ধর্মীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

৩। হযরত ওসমান গণি (রাঃ) তিনি ঈমানদার মুসলমান হওয়ার সাথে অদ্বিতীয় সত্যবাদী ছিলেন।

৪। হযরত আলী (দঃ) যিনি ইসলামী জগতের প্রথম বালক মুসলমান এবং ধৈর্যধারণকারী ঈমানদার ছিলেন।

উপরে উল্লেখিত দুই প্রকৃতির লোকের মধ্যে প্রথম বর্ণিত লোকেরা শুধু খোদার বিশ্বাসী ছিল যেমন আবু জেহেল ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকৃতির বর্ণিত লোকগণ ছিলেন ধর্মপ্রাণ ইসলাম দরদী। আল্লাহ পাক প্রথম বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে সূরা আসরের মধ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা দেন যে, তারা পরকালে বহু ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দোযখে প্রবেশ করবে। আল্লাহ পাক একই সূরার মধ্যে দ্বিতীয় দলের পক্ষে এ সুসংবাদ দেন যে, তারা ঈমান আনার পর নেক আমল করার দরুন বেহেশ্তী। এই সূরার মূল ভাষ্য হল যে, শুধু আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিশ্বাসী হওয়ার মধ্যে নাজাত নেই। নাজাত শুধু ধর্ম পন্থী হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

দেওবন্দী ওহাবীগণ আল্লাহর বাণী প্রিয় নবী (দঃ)-এর ইসলামী নীতিমালার পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলনা। তারা নজদী নীতিমালার উপর যতটুকু ভক্তি করত ততটুকু ভক্তি তাদের ইসলামী নীতিমালার উপর ছিলনা। ইসলামী নীতিতে রয়েছে সকল কাফের দোযখী। সেক্ষেত্রে দেওবন্দের বড় মুরব্বী গঙ্গুহী সাহেব ফতোয়া রশিদিয়াতে চিহ্নিত কাফের অর্থাৎ আবু জেহেলকেও আল্লাহ পাক মাফ করে বেহেশ্তে নেয়ার আকাংখা রাখেন। আর আরবের নজদী সাহেব পরিস্কার ঘোষণা দেন যে, কাফেরগণ তওহীদ বাদী ছিল তারাও বেহেশ্তে যাবে।

ধর্ম ও একত্ববাদের মূল্যায়ন

প্রত্যেক আম্বিয়ায়ে কেরামদের স্ব স্ব ধর্ম তাঁদের জন্য ছিল খাছ। যেমন আমাদের প্রিয়নবী হযরত রাসূলে পাক (দঃ)-এর জন্য ইসলাম ধর্ম খাছ। প্রত্যেক নবীদের ধর্মের স্বীকৃতি দাতা ছিলেন মহান আল্লাহ পাক।

যেমন হযরত রাসূলে পাক (দঃ)-এর ধর্মের স্বীকৃতি প্রদান করেন আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাক প্রিয় নবীর ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ان الدين عند الله الاسلام ইসলাম আমার মনোনিত ধর্ম এই ধর্মের প্রচারক রূপে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে নির্ধারণ করেছি। তাই হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ধর্মের নীতিমালাগুলোকে বিস্তার করেন। আর যারা এই ধর্মের অনুসারী হন তাঁদেরকে মুসলিম নামে আখ্যায়িত করেন। যেমন আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে هو سماكم المسلمين অর্থাৎ আমি ইসলাম ধর্ম অবলম্বীগণকে মুসলমান নামে নাম করণ করেছি এবং ইহা আল্লাহর একমাত্র ঘোষণা। এই ইসলামী দলের পরিপন্থী আর একটি দল রয়েছে যাদেরকে "কাফের" বলা হয়। এই দলকে আল্লাহ পাক يا ايها الناس অর্থাৎ তাদেরকে শুধু মানুষ হিসেবে গণ্য করেন, এদের কোন সম্মান-বৈশিষ্ট নেই। বরং তাদের বৈশিষ্ট হল যে, তারা নাফরমান এবং দোযখী।

আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরআন পাকে আরো ঘোষণা দেয়া হয়েছে ولا تموتن الا وانتم مسلمون অর্থাৎ তোমরা ইসলামী নীতিমালা পালন করে মরো। তোমাদের জন্য একমাত্র মুক্তির পথ হল "মিল্লাতে ইসলাম"। আল্লাহ পাক কখনো ঘোষণা দেন নি যে, আল্লাহর প্রভুত্ব ও একত্ব বিশ্বাসের মধ্যে পরকালের মুক্তি নিহিত রয়েছে। বরং ইসলামী মিল্লাতের প্রয়োজন মৃত্যুর আগে ও পরে সর্বকালেই রয়েছে। আমরা মৃত্যুর পূর্বে ইসলামী কালেমা পাঠ করে থাকি এবং মৃত্যুর পর মুর্দাকে بسم الله على ملة رسول الله পাঠ করে কবরস্থ করি। ইসলামের "১৪শ" বছর অতিবাহিত হল কেহ মুর্দাকে بسم الله على ملة الله পাঠ করে কবরস্থ করতে শুনা যায় নি। আল্লাহর রবুবিয়াত একত্ববাদ শুধু অন্তরের বিশ্বাসের জন্য, কর্মক্ষেত্রে বাস্তব রূপদানের জন্য নয়। ধর্মের গুরুত্ব আল্লাহর একত্ব প্রভুত্বের চেয়ে বেশী। দেখুন কবরে প্রত্যেক মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হয়। তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কি? এবং

তোমার নবী কে? এই তিনটি প্রশ্নের দু'টিই ধর্ম সংক্রান্ত, শুধু একটি প্রশ্ন আল্লাহ পাক সম্পর্কীয়। এ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, শুধু আল্লাহর বিশ্বাসের দ্বারা কারও নাজাত নাই।

দীনে তাওহীদের মোকাবিলায় ইসলাম ধর্ম

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী আরো বলেছেন, ইসলাম ধর্মের সূচনাকালের মুসলমানগণ হতে মক্কার কাফেরগণ হজ্জ ওমরা পালনে অগ্রগামী ছিল। কাফেরগণ হজ্জ পালন করতো দীনে এলাহীর অনুসারী হয়ে সেক্ষেত্রে মুসলমানেরা পালন করতো ধর্ম ও ইসলামের নীতি। নজদী সাহেব ইসলাম ধর্মকে মোটেই মেনে নিতে চায়না। তবে কালামুল্লাহ ইসলাম ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর দীনে এলাহীর তথাকথিত মতবাদকে নিম্ন আয়াত দ্বারা রহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

হে মুসলমানগণ! আজই আমি তোমাদের ধর্ম ইসলামকে পরিপূর্ণ ঘোষণা দিলাম এবং উহা আমার মনোনীত ধর্ম। মুসলিম উম্মার ঐক্যমতের উপর উল্লেখিত আয়াতটি প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) আল্লাহর ঘরের ইসলামিক পদ্ধতিতে হজ্জ কর্ম সম্পন্ন করে তিনি যখন আরাফাত ময়দানে উপস্থিত হন সেই মুহূর্তে উল্লেখিত আয়াতটি নাযিল হয়।

আল্লাহ্ পাক প্রিয় নবীর হজ্জ পালন পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, আমি দীনে তাওহীদ বা দীনে এলাহী পালনকে রহিত করে আপনার সঠিক পদ্ধতিতে হজ্জ পালনকে স্বীকৃতি প্রদান করলাম। আপনি কাবাতে যে, হজ্জ কার্য পালন করেন আমি তার নাম রাখলাম সঠিক হজ্জ। অতএব আপনি ইসলামী পদ্ধতিতে হজ্জপর্ব পালনের জন্য উপদেশ প্রদান করুন। আপনি ঘোষণা দিন যে, আজ হতে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে দীনে তাওহীদ বা দীনে এলাহী নামের ধর্মটি রহিত হয়ে গেল। মক্কার চির-চরিত কাফেরগণ ইসলাম ধর্মের সূচনাকালে কুফরী পদ্ধতিতে হজ্জ তওয়াফ পালন করতো। যেমন কা'বা ঘরের চতুর্দিকে চক্কর দেয়া কালে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে সঠিক তওহীদ পালন মনে করতো। একদিন আসাপ (পুরুষ) ও নায়েলা (মহিলা) উভয়ে কা'বার আঙ্গিনাতে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আল্লাহ পাক এ কুপদ্ধতির হজ্জ পালনে নারাজ হয়ে শাস্তি স্বরূপ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের দৈহিক আকৃতি বিকৃত করে দেন। কা'বার অন্যান্য হজ্জ পালনকারীগণ ঐ নারী ও পুরুষের মৃত দেহকে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের তলদেশে পাশাপাশি দাফন করে। কাফেরেরা এই কুপদ্ধতিতে হজ্জ পালন করেও নিজেদেরকে তাওহীদ পন্থী বলে ধারনা করতো।

আজ কাল যারা ইসলাম ধর্মের নীতিমালার পরিবর্তে কুফরী নিয়ম নীতি পালন করছেন তারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছেন। আজকাল ওহাবী পন্থী তথাকথিত তাবলীগবাদী অনেক লোকের পরিভাষাও বদলিয়ে গেছে, তারা দীনে ইসলামের বদলে দীনে এলাহী বাক্যটি বলে, ধার্মিক শব্দের বদলে খোদা ভক্ত বলে। মুসলমান ভাইয়ের বদলে দীনী ভাই বলে। ধর্মীয় খেদমতের বদলে একরামুল মুসলিমীন বলা চালু করেছে। তাদের এসব শব্দ বা পরিভাষা প্রয়োগের মধ্যে শত মতলব লুকায়িত আছে। প্রকৃত পক্ষে তারা আল্লাহ্ পাকের দোহাই দিয়ে ইসলামী নীতিমালাকে ধ্বংস করছে। তাবলীগের নামে ইলিয়াসী প্রথা চালু করছে। বড় মুরব্বী ইসমাইল সাহেব তার পীর সাহেবকে আল্লাহ্ পাকের হাতে মুরীদ করায়ে ভণ্ড তরীকত চালু করে। ইলিয়াছ সাহেব স্বপ্নের গুরুত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তাবলিগী প্রথা চালু করছে। বড় দুঃখ ওহীর মাধ্যমে পাওয়া বস্তু মূল্যহীন। যদি তাবলিগ বাদীদের ইসলাম বাদের দাবী থাকে তবে ৬ উছুলের পরিবর্তে ইসলামের পাঁচ রোকনের প্রচার করতে আপত্তি কেন?

মূর্তি নির্মানের সমর্থনে ওহাবী নজদী

ওহাবী প্রধান শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব তার রচিত পুস্তক কাশফুশ শুবহাতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় মক্কার কাফেরদের কুফরী কর্মের অর্থাৎ মূর্তি নির্মাণকে সমর্থন প্রদান করেছে। ওহাবী সাহেব উক্ত পুস্তকের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের হাবীব রাসূলে পাক (দঃ) কে দোষী সাব্যস্ত করে বলে, মক্কার কাফেরগণ ছিল নেক্কার। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সেই নেক লোকদের মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে চুর্ণ বিচুর্ণ করে বদকার হন।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর এই বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে স্বয়ং কাফের মূর্তি পূজক ছিল। নচেৎ সে কি করে তার পুস্তকে ইসলাম বিরোধী এই কটাক্ষ উক্তি করল। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) যে মক্কার কাফেরদের মূর্তি সমূহ ভেঙ্গে চুরমার করেন তাও আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে। এ মূর্তি ভাঙ্গার প্রাথমিক কারণ ছিল যে, কাফেরগণ ইসলাম কবুল না করার জন্য, একটি পংক্তির মাধ্যমে একটি সন্ধি করেছিল, যার পূর্ণ বর্ণনা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কোরআনে সূরা কাফেরুনের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এই পবিত্র সূরাটি প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর উপর মক্কায় অবস্থান কালে অবতীর্ণ হয়েছিল।

কাফেরদের দলপতি যেমন ওলীদ, আছ, আসওয়াদ ও উমাইয়া প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর আস্তানায় উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কতিপয় প্রতিমা নির্মাণ করেছি। আপনি যদি আমাদের এই প্রতিমা সমূহের বিরোধীতা না করেন, তাহলে আমরা আপনার প্রভুর পূজা করতে কোন আপত্তি করব না। তদুত্তরে হুজুর পাক (দঃ) বললেন, আমি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। ইসলামে মূর্তি পূজার কোন স্থান আদৌ নেই। মূর্তি পূজাতো ধর্মনাশা কার্য। তাই আমি এই কুকর্ম পালনে কাওকে অনুমতি দিতে পারিনা এবং এই কুকর্মের সমর্থনে তোমাদের সাথে কোন সন্ধি স্থাপন করবো না। আমি অচীরে আরব ভূখন্ড হতে মূর্তি পূজা বন্ধ করার চেষ্টা করবো। এই জবাব প্রদান করতঃ নবী করীম (দঃ) নিজ বক্তব্য শেষ করলেন।

আরবের কতিপয় চিহ্নিত কাফেরদের সাথে উল্লেখিত প্রশ্নোত্তর পর প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। তবে তিনি মূর্তি ভাঙ্গার কোন সুযোগ লাভ করতে পারেননি। তিনি ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে হিজরত করে মদীনায় চলে যাওয়ার পর হিজরী ৬ সনে খানায়ে কা'বার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ১৭/১৮শত সাহাবাগণকে সঙ্গে করে মক্কাভিমুখি হয়ে ছিলেন, তবে তাঁর সে উদ্দেশ্য সফলকাম হয়নি।

হিজরী ৮ সন মোতাবেক ৬৩০ খৃঃ প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) দশ হাজার সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কাভিমুখি হন এবং পথিমধ্যে আরব কাফের নেতা আবু সুফিয়ান মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) সর্ব প্রথম কা'বা গৃহে প্রবেশ করে নির্দেশ দিলেন যে, কা'বা ঘর হতে সমস্ত মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চুরে দূরে ফেলে দাও। স্বয়ং তিনি جاء الحق وزهق الباطل এই আয়াত খানা পাঠ করতে করতে মূর্তি সমূহের উপর বারংবার আঘাত করতে থাকেন। একের পর এক একটি মূর্তিকে ভেঙ্গে আল্লাহ পাকের ঘর (কা'বা শরীফ)-কে প্রতিমা মুক্ত করেন।

মূর্তি ও প্রতিমা সমূহকে ভাঙ্গার পর আল্লাহর ঘরে ইসলামী তরীকায় হজ্ব ও তাওয়াফের সঠিক পদ্ধতি চালু করেন। ইতিপূর্বে কাফের কর্তৃক যে হজ্ব প্রথা চালু ছিল তা ছিল কুফরী কর্ম। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সাহেব ইসলামী হজ্ব-পদ্ধতিকে পরিহার করে কুফরী পদ্ধতির হজ্ব পালনকে সমর্থন দান করে বলেন, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) নেককার কাফেরদের মূর্তি ভেঙ্গে আল্লাহর ঘরে ইসলামী পদ্ধতিতে হজ্ব প্রচলন করার কি প্রয়োজন ছিল।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ঃ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী তার রচিত ১। কিতাবুত তাওহীদ। ২। কাশফুশ শুবহাত নাম্নী দুটি পুস্তকের মধ্যে ইসলাম ধর্ম ও আল্লাহ পাকের রাসূলের বিরুদ্ধে শতশত কঠাক্ষ উক্তি করেছেন। ধর্মনাশা উক্ত দু'খানা পুস্তক গোপনে গোপনে এতদ্দেশে বাংলা ও উর্দু ভাষায় বহুল প্রচারিত হয়েছে। প্রথম পুস্তকটির মধ্যে লেখা রয়েছে যে, প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মরে মাটিতে মিশে গেছেন। হুজুর পাকের বিন্দু মাত্র অদৃশ্যের এলেম ছিলনা ইত্যাদি আরও বহু বাতিল কথা বলেন। দ্বিতীয় পুস্তক খানাতে নজদী সাহেব বলেছে ঃ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কাফের কর্তৃক নির্মিত মূর্তি ভেঙ্গে অন্যায় করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। তৎকালীন মুসলমান হতে কাফের মুশরিকগণ প্রত্যেক দিক দিয়ে সমুন্নত ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি আরো বহু কুফরী কালাম উক্ত বইখানাতে নজদী সাহেব লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি উল্লেখিত পাঠে তার প্রত্যেক কুফরী কালামের জবাব দিয়েছি। আপনারা জবাবগুলো কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হল কিনা একটু বিবেচনা করুন।

দ্বিতীয় পাঠ

ভারত উপমহাদেশে তরীকত শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার

অনেকেরই ধারনা যে, ভারত উপমহাদেশে স্বয়ং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) পদার্পন করে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু ইহা ভুল ধারণা, তবে সত্য কথা যে, তাঁরই চেষ্টার মাধ্যমে ভারতে ইসলাম প্রচার সূচীত হয়। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সর্ব প্রথম কতিপয় সাহাবায়ে কেরামকে ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে ভারতে প্রেরণ করেন। যাঁদের প্রধানের নাম ছিল 'মাহলাব' বিন সাফরা (রাঃ)। তিনি তাঁর কতিপয় সঙ্গী সাহাবাকে নিয়ে প্রথম ভারতের "সিন্দু" ও পাঞ্জাবে আগমণ করেন। কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁরা সে স্থানে অবস্থান করে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান প্রচার করতে থাকেন। সাহাবা কেরামদের পর ভারত উপমহাদেশে আওলীয়া কেরামগণ ধারাবাহিক ভাবে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। যাঁদের কতিপয় আওলীয়াদের নাম যথাক্রমে এই : **হযরত খাজা মুয়িনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ)। হযরত দাতাগঞ্জ বখ্‌স (রহঃ) হযরত গাঞ্জে শকর ফরিদ (রহঃ)। হযরত গাউস বাহাউল হক (রহঃ)। হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ)।** আরও বহু আওলীয়ায়ে কেরামগণ ভারত বর্ষে বহু আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের বিধি বিধানকে যথারিতি প্রচার করেন।

ধর্মপ্রচারকগণের কারো কারো জন্মভূমি ভারত উপমহাদেশ হলেও তাঁদের অনেকের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন নবী, সাহাবী ও আওলাদে রাসুলগণ। আওলীয়ায়ে কেরামদের প্রথমে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম ছিল

মৌখিক। পরবর্তী যুগে মৌখিক প্রচারের সঙ্গে সংযোজন করা হল তরীকায়ে তরীকত বা বাইয়াত। এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমে আওলীয়ায়ে কেরামগণ যুগ যুগ ধরে ধর্ম প্রচারে আত্ম নিয়োগী হন।

একদল ক্ষুদ্রজ্ঞানী মৌলভীগণ বলেন যে, আওলীয়াগণ যে তরীকত ও বাইয়াত এর যে, নিয়ম চালু করেছেন তা শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ প্রিয় নবী রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর যুগে এই দু'টি নিয়ম নীতির আদৌ প্রচলন ছিলনা। আওলীয়ায়ে কেরামগণ এই প্রথাকে আবিস্কার করেছেন। প্রত্যেক নতুন পদ্ধতি বা আবিস্কার বেদআতের শামিল।

আমরা বলি যে, যদি আওলীয়াগণ বাইয়াত বা তরীকর শিক্ষার প্রচলন না করতেন তবে ভারত উপমহাদেশের মানুষ অমুসলিম থেকে যেতো। আওলীয়াদের এই অবদানের ফলে আজ আমরা মুসলমানের দাবীদার হয়েছি।

বাইয়াতে রাসুল ও বাইয়াতে সাহাবার মাধ্যমে তরীকত শিক্ষা

বাইয়াত ও তরীকতকে আবিস্কার বা বেদআত বলা প্রকাশ্য অজ্ঞতা। কারণ স্বয়ং মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) বাইয়াতে রেদওয়ান প্রতিষ্ঠা করে এ সুপ্রথার প্রচলন করান। আর মক্কা বিজয়ের দিন সাফা পাহাড় ও মক্কার আঙ্গিনায় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর হাতে মহানবী হুজুর (দঃ) সকল বিধর্মীকে বাইয়াত হবার নির্দেশ দেন। এতে প্রমাণিত ও প্রতিয়মান হল যে, উপরে উল্লেখিত দু'টি প্রথার প্রচলন নবী ও সাহাবাদের যুগেও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক যুগের আওলীয়ায়েকেরামগণ ইসলাম প্রচার ক্ষেত্রে উক্ত দু'প্রথার অনুসরণ করে আসছেন। বাইয়াত ও তরীকত এই দু'প্রথা শুধু ধর্ম প্রচার ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য। যেমন মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) শুধু ইসলামী আন্দোলনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরামদের হতে অঙ্গীকার নেন। এই ইসলামী অঙ্গিকার পরবর্তীতে সুন্নাতে রাসুল রূপে আখ্যায়িত হয়। আর সাহাবায়ে কেরামগণের কর্ম অনুসরণ পদ্ধতি সুন্নাতে রূপান্তরিত হয়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : عليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين রাসুলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন, হে আমার উম্মতগণ! তোমাদের উপর আমার কৃতকর্মকে যেরূপ যথাযথভাবে পালন করা সুন্নাত, ঠিক তেমনই খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পদ্ধতিকে যথাযথভাবে পালন করাও সুন্নাত। হুজুরে পাক (দঃ) এর কর্ম অনুসরণ ও সাহাবায়ে কেরামদের কৃতকর্ম পালন পদ্ধতি সুন্নাতে রূপান্তরিত হওয়ার মূল কারণ হল যে, সাহাবায়ে কেরামগণ কর্ম পালন ক্ষেত্রে হুজুর (দঃ) এর পূর্ণ অনুসরণ করতেন। সে হিসেবে সাহাবাগণের অনুসরণ করা হুজুরে পাক (দঃ) এর অনুসরনের নামন্তর। আর আওলীয়ায়ে কেরামগণ মহানবী ও সাহাবায়ে কেরামগণের কর্মের অনুসরণ করতেন। তাঁরা ভারত উপমহাদেশে তরীকতের মধ্যে যতটুকু ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের এই অবদানের ফলে আজ আমরা মুসলমান হওয়ার দাবীদার হই। যদি তাঁরা কোন বেদীনকে শুধু ইসলামী কালেমা পাঠ করায়ে তরীকতহীন বা লাগামহীন ভাবে ছেড়ে দিতেন তাহলে তাদের এই ঈমানী কালেমা পাঠ হয়ত অর্থহীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অতি প্রবল।

সাহাবায়ে কেরামগণ প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর কর্ম পালন পদ্ধতিকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন। তদ্রুপ এক আওলীয়া পূর্ববৎ আওলীয়ার কর্মের পূর্ণ অনুসরণ করেছেন। যেমন হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ) এর পূর্ণ অনুসরণ করেন হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ)। তাঁদের পর খাঁটি ওলী উল্লাহগণও তরীকত প্রচার ক্ষেত্রে সাম্যতা বজায় রেখে চলেছেন। ভারত উপমহাদেশের পূর্ববৎ সকল আওলীয়াগণ বংশগত দিক দিয়ে প্রায় সম্পর্কিত ছিলেন নবীর বংশের

সাথে। অথবা সাহাবা অথবা আওলাদে রাসুল বর্গের সাথে। যেমন শাহ্ জালাল (রহঃ) ছিলেন মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) এর প্রশংসিত ইয়ামন প্রদেশের অধিবাসী। তাই তাকে শাহ্ জালাল ইয়ামনী বলা হয়। মোজাদ্দেদে আলফে সানীকে আল ফারুকী বলা হয়। কারণ তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর বংশধর। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রঃ) ছিলেন শাহ্ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) এর ভাগনে। আবার তিনি ছিলেন হযরত হাসান হোসেন (রাঃ) এর বংশধর।

উপরে উল্লেখিত আওলীয়ায়ে কেরামগণের বদৌলতে ভারত বর্ষে ইসলাম প্রচার সূচীত হয়। তাঁরা ইসলামের রীতিনীতিকে যথাযথ ভাবে পালনের জন্য একটি নতুন পথ আবিস্কার করেন, যার নাম হল তরীকত। এই খাঁটি তরীকত পরিপন্থী যতগুলো নতুন পথ বের করা হয়েছে সেগুলো হল বাতিল পথ। সেই পথের পথিক হলে দোযখে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

ভারতে নতুন তরীকত উদ্ধার :

ভারত উপমহাদেশে ওহাবী তরীকা আনয়নকারী জনাব ইসমাইল দেহলভী স্বমাতৃভূমি ভারতে একটি নতুন তরীকত উদ্ধার করেন। যার নাম ছিল "তরীকতে তাওহীদ"। অর্থাৎ আল্লাহর পথের পথিক হওয়া। তবলীগী তরীকত যেরূপ স্বপ্নে পাওয়া ছিল, তদ্রুপ এই নতুন তরীকত খানাও স্বপ্নে পাওয়া ছিল। দেহলভী সাহেব স্বপ্নে দেখলেন যে, আল্লাহ পাক তার বন্ধু সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভীকে নিজ হাতের মধ্যে রেখে ফয়েজ প্রদান করেছেন। সৈয়দ সাহেবকে এই স্বপ্নের কথা যখন বলা হল তখন তিনি খোদার হাতের মুরীদ হওয়ার দাবীদার হয়ে প্রথম মুরীদ বানালেন ইসমাইল সাহেবকে। এই নতুন তরীকতের বিস্তারিত কাহিনী ইসমাইল

কর্তৃক প্রকাশিত সিরাতুল মুস্তাকীম নামক ফার্সী কিতাবের ১৬৪ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে। খোদার তরীকত হতে ভারত উপমহাদেশে সুন্নী নীতিমালার পরিপন্থী আর একটি নতুন পদ্ধতি চালু হয়। এ নতুন তরীকতের অনুসারী হলেন প্রত্যেক ওহাবী ফের্কার লোকেরা।

সম্রাট আকবরের “দ্বীনে এলাহী ও মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) এর মোজাদ্দেদিয়া তরীকা

সম্রাট আকবরের আমলে ওলীয়ে কামেল ইমামে রব্বানী হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) তাঁর গবেষণামূলক বিশেষ নিয়ম নীতির তরীকতের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর সেই নীতি সমূহের মধ্যে অন্যতম নীতি ছিল লঙ্গর খানা ও খানকার ব্যবস্থা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শাসক, অবহেলিত সাধারণ জনতা যারা বড় গরীব দুঃখী এবং দু'বেলা খাবার পেতনা তারা ঐ লঙ্গর খানায় এসে ভিড় জমাত। মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) এসব গরীব দুঃখীদের মধ্যে খাবার পরিবেশণ করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে ইসলামের নীতিমালা বিস্তার করতে থাকেন। মোজাদ্দেদে আলফে সানীর এই সুন্দর নীতি দেখে ধীরে ধীরে জনসাধারণ মোজাদ্দেদীয়া তরীকায় শামিল হতে থাকে।

সম্রাট আকবর দেখলেন যে, মোজাদ্দেদীয়া তরীকা পালন করতঃ ভারতের সাধারণ অসাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। তখন সে এই তরীকার পরীপন্থী একটি নতুন ধর্মমত প্রচার শুরু করেন, যার নাম ছিল "দ্বীনে এলাহী" মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) সম্রাট আকবরকে বুঝালেন যে, প্রিয়নবী (দঃ)-এর 'দ্বীনে ইসলাম' বিদ্যমান থাকতে আপনার মনগড়া ধর্মের কোন মূল্য নেই। এ ছাড়া আল্লাহ পাকেরতো কোন খাছ ধর্ম নেই। ধর্মতো নবীগণের ছিল। আপনার দ্বীনে এলাহীকে ধর্ম নাম করণ করেন তবে সে ধর্মের প্রবর্তকের নাম কি? অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ইসলাম ধর্মের স্থানে আপনার "দ্বীনে এলাহী" ধর্মটি বাতিল ধর্ম রূপে গণ্য। আপনি এ বাতিল ধর্ম প্রচার হতে বিরত থাকুন। শেষ পর্যন্ত মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) আন্দোলন করে সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহী নামের তথাকথিত ধর্মকে বাতিল ধর্ম বলে ঘোষণা দেন। অন্য দিকে মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) ভারত বর্ষের মানুষকে তরীকত পন্থী করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তোলেন। তাঁর তরীকতের রূপরেখা নিম্ন রূপ :

ইমামে রব্বানী হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) ছিলেন :
১। নকশ্‌বন্দীয়া। ২। চিশ্‌তীয়া। ৩। কাদেরীয়া। ৪। সহরাওয়ারদীয়া ইত্যাদি সকল তরীকার একজন কামেল পীর ও খলিফা। তবে তাঁর নিজের নকশেবন্দীয়া তরীকাটি পালনক্ষেত্রে অত্যন্ত সরল সহজ ছিল। তাই এই তরীকাটি ভারত উপমহাদেশে জনপ্রিয় হয়।

খ্যাতনামা জ্ঞান ভান্ডার শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভীর তরীকত প্রশিক্ষণ

শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) এর পিতা শেখ আবদুর রহীম (রহঃ) হতে তিনি তরীকত শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর উক্ত শিক্ষা লাভ হয়েছিল মক্কা ও মদীনার বিশিষ্ট আলেমগণ হতে। তিনি প্রথমে

ভারত উপমহাদেশে প্রিয় নবী হুজুর (দঃ) এর হাদীস শাস্ত্র বিস্তারের প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাই তিনি ইমামে আহলে সুন্নাত নামে খ্যাত তিনি ভারত উপমহাদেশে এলমে দীন বা ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৬০টি বিশাল গ্রন্থাবলী রচনা করেন। ভারত উপমহাদেশে শাহ্ ওলী উল্লাহ (রহঃ) এর শুভাগমন না হলে আমার মনে হয় এতদ্দেশের সকল মানুষ মূর্খ জাহেল ও অজ্ঞ থেকে যেত। তৎকালে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের বাণী পবিত্র কোরআন পাকের শুধু তেলাওয়াত করাই জানতো কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারতো না। সর্ব প্রথম তিনি ভারত উপমহাদেশে ফার্সী ভাষায় কোরআনের অর্থ প্রকাশ করেছিলেন। কেননা তৎকালীন রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সীতে। তাঁর এ বিরাট অবদানকে তৎকালীন ক্ষুদ্রজ্ঞানী তথাকথিত আলেমগণ বরদাশত করতে পারে নি। তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ফার্সী ভাষায় কোরআনের অনুবাদ করাকে কোরআন অবমাননাকর বলে প্রতিবাদের প্রবল ঝড় তুলেছিল। শাহ সাহেব এই অবুঝ মৌলভীগণকে বুঝায়ে সামাল দিতে বড় কষ্ট হয়েছিল। তারা শুধু ফোরকানীয়া মাদ্রাসা স্থাপন করে কোরআন শিক্ষা করা কোরআন নাজিল এর প্রধান লক্ষ্য ছিল বলে অনুধাবন করতো। শাহ সাহেব (রহঃ) বুঝালেন কোরআন নাজিল হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করা। যে কোন ভাষাতেই হোক না কেন কোরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করা কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্যের শামিল। শেষ পর্যন্ত উক্ত মৌলভীগণ শাহ সাহেবের কোরআনের ফার্সী অনুবাদকে ধর্মীয় খেদমত বলে আখ্যা দিতে বাধ্য হয়। শাহ (রহঃ) সাহেব অনুবাদ রচনা ও গ্রন্থাবলী দ্বারা যেরূপ ভারতে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করেন, তদ্রূপ তিনি মোজাদ্দেদে আলফে সানীর তরীকত শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ধর্ম শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। শাহ সাহেবের পর তাঁর স্বনাম ধন্য ছেলেরাও তাঁর উল্লেখিত দুই ধরণের ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করে ছিলেন। তবে শাহ সাহেবের এক নাতি যার নাম ছিল মৌলভী

ইসমাইল দেহলভী সে বাপ দাদার সমুন্নত সুন্নী নীতিমালার বিরুদ্ধে একটি নতুন তরীকত উদঘাটন করেন যার নাম ছিল "খোদার তরীকত'। কিন্তু এই আধুনিক তরীকতটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) মানুষের মধ্যে রচনাবলী ও গ্রন্থাবলী দ্বারা যেরূপ শিক্ষার আলো বিস্তার করেছিলেন তদ্রূপ তার পাশাপাশি তিনি আর একটি নতুন পদ্ধতি চালু করেছিলেন। যার নাম তরীকত শিক্ষা। এই তরীকত দ্বারা সাধারণ মানুষ বিশেষ ভাবে উপকৃত হত। শাহ সাহেব এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমে আজীবন ভারত উপমহাদেশে ধর্ম বিস্তারের সংগ্রামে আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বড় ছেলে আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) মোহাদ্দেসে দেহলভীর হস্তে উপরে উল্লেখিত দুই বিষয়ের ইসলামী খেদমতকে যথাযথভাবে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। তিনি ও তাঁর পিতার উপদেশ ও নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তবে তাঁর শেষ জীবনে আহলে সুন্নতের নীতিমালা ও ধর্ম বিরোধী দু'টি ভ্রান্ত মতবাদী দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। প্রথম দলের নাম শিয়ামতবাদী এবং দ্বিতীয় দলের নাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারী ওহাবী ফের্কা।

শাহ আবদুল আজিজ কর্তৃক শিয়া দমন ঃ

শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) শিয়া দলকে দমন কল্পে 'তোহফা ইসনা আশারীয়া' নামক একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থখানার মধ্যে সুন্নী ওলামায়ে কেরামদের স্বহস্তে দস্তখত রয়েছে। এই দমন নীতির পর হতে শিয়া দল ভারত উপমহাদেশ হতে চিরতরের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। ওহাবী ফের্কা পন্থীগণ শিয়া দলের সমর্থনে বহু ফতোয়া রচনা করেও ব্যর্থ হয়। শাহ সাহেব বহিরাগত ধর্ম শত্রুদেরকে

দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশের ইসমাইল দেহলভী নামক একজন সুন্নী নীতিমালার পরম শত্রুকে দমন করতে সক্ষম হননি। সে একটি পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের নীতিমালার উপেক্ষা করে জন্ম দিল ভারতের বুকে ওহাবী ফের্কা বনাম খারেজী মাযহাব। আমি এখন ওহাবী মাযহাব প্রবর্তনের ঘটনা বর্ণনা করছি।

ভারত বর্ষে ওহাবী ফের্কা

ইসমাইল দেহলভী ছিল ইমামে আহলে সুন্নত শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর আপন ভাতিজা। ইসমাইল সাহেব বাল্য শিক্ষা হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সম্পন্ন করেছিল শাহ সাহেবের নিকট। তবে সে একটি পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে গৃহ হারা হয়ে ভারত উপমহাদেশে ওহাবী নামের এক নতুন ফেকার উদ্ভব ঘটায়।

শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) সকল ভাইদের মধ্যে বড় ছিলেন। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি তাঁর পিতার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিকে একটি বন্টক নামার মাধ্যমে প্রত্যেক হকদারের মধ্যে ভাগ বাটওয়ারা করেন। ইসমাইলের পিতা তার দাদা বিদ্যমান থাকাতে মৃত্যু বরণ করার কারণে সে তার দাদার সম্পত্তি থেকে আল্লাহর আইনেই বঞ্চিত হয়। তারপরও দয়া করে শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী নিজের অংশ ও অন্যান্য ভাইদের অংশ হতে কেটে এই পরিমান সম্পত্তি ইসমাইলের জন্য নির্ধারণ করেন যাতে সে শাহ বংশে বসবাস করতে পারে। কিন্তু ইসমাইল আপত্তি করল যে, আমি আমার বাবার পুরো অংশ চাই, নচেৎ আমি মোটেই কিছু নিবনা। শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রঃ) বুঝালেন যে, তুমি আল্লাহ পাকের আইন মোতাবেক সম্পত্তি মোটেই পাচ্ছনা সে ক্ষেত্রে আমি তোমার জন্য উল্লেখিত হারে কিছু সম্পত্তি নির্ধারণ করেছি। তুমি আমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নাও।

ইসমাইল দেহলভী চাচার বন্টকী সিদ্ধান্তের অবহেলা করে ঘর ছাড়া হয়ে নতুন বুদ্ধি খাটায়। ইসমাইল বড় বক্তা ছিল, অনেক দিন পর্যন্ত দেশে দেশে গ্রামে গঞ্জে ওয়াজ নসিহত করে বেড়ায়। মানুষ তাকে শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) এর নাতি হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতো।

ইসমাইল সাহেব দেশে ফিরে কিছু দিন পর শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) এর এক জামাতা মৌলভী আবদুল হাই (মাহমী) কে পক্ষ করে শাহ সাহেবের কিছু সম্পত্তি জবর দখল করে নেয়। আর প্রকাশ্য বন্টক নামার উপেক্ষা করতে থাকে। এতে ইসমাইলের কোন লাভ হল না, কারণ শাহ আবদুল আজিজ সাহেবের অন্যান্য ভাইগণ বন্টন নামার পক্ষে ছিলেন। তাঁরা সকলে একত্রিত হয়ে ইসমাইলকে সম্পত্তি হতে বেদখল করে দিলেন।

ইসমাইল সম্পত্তি পুনঃ দখল করার জন্য ভারত বিখ্যাত খবীর চাবিন এবং বড় লাঠিয়াল সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভীর নিকট গমন করে। ব্রেলভী সাহেব বললেন সম্পত্তির দখল করার পূর্বে শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামত দখল করে নও। অথবা তাঁর এই ইমামতির বিপক্ষে নতুন কোন তরীকা কায়েম কর। ইসমাইল সাহেব বহু চিন্তা ভাবনা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিপক্ষে প্রথমে খারেজী মাযহাব সমর্থন করে। পরবর্তিতে এই মাযহাব খানাকে ওহাবী মাযহাবে রূপান্তর করেন। অন্য দিকে সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামতির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর শিষ্যত্ব লাভ করেন। কিছু দিন যেতে না যেতে শাহ সাহেবকে বলে আমার জাহেরী শিক্ষা বন্ধ করুন। আমি কালো অক্ষর সাদা দেখছি। শাহ সাহেব বুঝতে পারলেন যে, সৈয়দ আহাম্মদের মতলব খারাপ। কালো অক্ষর সাদা দেখনির তথাকথিত অর্থ এই যে, সে কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছে গেছে।

এখন শুধু বাকী রয়েছে আমার থেকে আহলে সুন্নাতের খেলাফতটা নেয়া। শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) এই কুমতলবী ছাত্রের উপর রাগান্বিত হয়ে নিজ ভাই শাহ আবদুল কাদের দেহলভীকে বললেন, ব্রেলভীকে আমার পাঠশালা হতে বের করে দাও। শাহ আবদুল কাদের (রহঃ) তাকে বের না করে কিছু দিন পর্যন্ত নিজেই শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু ব্রেলভীর শিক্ষালাভের একই নতিজা দাড়ালো যা আবদুল আজিজ দেহলভী (রহঃ) এর নিকট দাঁড়ায়েছিল।

শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) এর উল্লেখিত ব্রেলভী ও ইসমাইল দুজন বিদ্রোহী ছাত্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শাহ সাহেবের সুন্নী নীতিমালাকে বদনাম করার জন্য নতুন আন্দোলন শুরু করেন। সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী সাহেব হজ্জ পালনের ভান করে মক্কায় গিয়ে ওহাবী নীতিমালার কিতাবুত তাওহীদ নামক পুস্তক খানা কতিপয় নজদবাসীর মাধ্যমে দিল্লী প্রেরণ করান। উক্ত বই খানা ইসমাইলের হস্তগত হওয়ার পর তিনি বইখানার উর্দু অনুবাদ করে হিন্দুস্থানে প্রচার শুরু করেন। এই অনুবাদের নাম রাখা হয়েছিল তাকবীয়াতুল ঈমান।

ওহাবী ফের্কার সাথে সুন্নীদের প্রথম বহছ ঃ

এই ধর্মনাশা পুস্তকের সমর্থন নেয়ার জন্য ১২৪০ হিজরী সনে ইসমাইল সাহেব মৌলভী আবদুল হাই এবং মৌলভী আবদুল গণি মাহমী সাহেবানকে সঙ্গে করে দিল্লী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে সুন্নী ওলামায়ে কেরামদের সঙ্গে তর্ক বহছে উপনীত হন। বহছের বিষয় বস্তু অনেক ছিল তন্মধ্যে প্রথম বিষয় ছিল যে, হযরত নবী করীম (দঃ) একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং আমাদের মত মানুষ ছিলেন।

সুন্নী ওলামায়ে কেরামগণ উল্লেখিত মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা উত্তর দিলেন। তখন ইসমাইল দেহলভী নিরোত্তর হয়ে পালাবার চেষ্টা করেন এবং পালায়েও গেলেন।

ইসমাইল সাহেব বহছে অপদস্ত হওয়ার পর দিশেহারা হয়ে সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভীর নিকট গিয়ে বললেন যে, তর্ক বহছ দ্বারা ওহাবী নীতি মালা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব, তাই এখন হতে আমার নতুন তরীকত পন্থী হতে হবে। তাই আপনি আমাকে সেই নতুন তরীকতের সবক প্রদান করুন। এই কথার প্রতি উত্তরে সৈয়দ সাহেব বললেন, আমার নিজেরই তরীকতের বাইয়াত নেই সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে তরীকতের সবক দিলে তা বিশ্বাস করবে কে? ইসমাইল সাহেব নিরাশ হয়ে ব্রেলভী সাহেবকে বললেন, আমি আপনার জন্য তরীকতের সবকের বিশেষ ব্যবস্থা করছি আপনি শান্ত থাকুন। শেষ পর্যন্ত ইসমাইল সাহেব সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী সাহেবকে নিম্ন নিয়মে আল্লাহ পাকের হাতে বাইয়াত করালেন। এই আধুনিক নিয়মের এই তথাকথিত বাইয়াতের ঘটনাটি ইসমাইল দেহলভী তার ফার্সী কিতাবের মধ্যে নিম্নরূপে বর্ণনা করেন।

খোদার হাতে প্রথম মুরীদ হন কে ঃ

روزے حضرت جل و علا دست راست ایشان را بدست قدرت خاص خود گرفته وچیزے را از امور قدسیه که رفیع وبدیع بود پیش روئے حضرت ایشان کرده فرمود که ترا چنیں دادم و چیزهائے دیگر خواهم داد۔ (صراط المستقیم فارسی مصنفه محمد اسماعیل صاحب ص۱۶۴ مطبوعه مجتبائی)

ইসমাইল দেহলভী সাহেব বলেন: একদা আল্লাহ পাক জনাব সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী সাহেবের হাতকে চেপে ধরে কতিপয় উচ্চমানের অদ্বিতীয় পাক পবিত্র বস্তু তাঁর হতে প্রদান করে বলেন, হে সৈয়দ! এই মুহূর্তে আমি তোমাকে এতটুকু ফয়েজ দিলাম। পরবর্তীতে আমি তোমাকে আর অনেক ফয়েজ প্রদান করতে ইচ্ছা রাখি। অর্থাৎ এতদ্দেশে পীরগণ সাধারণ মানুষকে যেমন মুরীদ করার জন্য পীরের হাতের উপর মুরীদের হাতকে রেখে বাইয়াত করান, অবিকল সেই রূপ আল্লাহ পাক সৈয়দ সাহেবের ডান হাতকে তাঁর নিজ হাতে রেখে মুরীদ করেনিলেন।

فرمود له که امروز حق جل وعلا بمحض عنایت خود
بلا توسط احدی اختتام نسبت چشتیه بما ارزانی داشت
(صراط المستقیم ص—۱۶۶)

সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী সাহেব আল্লাহ পাকের হাতের মুরীদ হওয়ার পর একটি ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ পাক নিজেই করুণা করে কোন মানুষের উসিলা ছাড়া একক ভাবে আমাকে চিশতিয়া তরীকা বখশিস করলেন। অর্থাৎ শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর মোজাদ্দেদিয়া তরীকার আমার আদৌ প্রয়োজন নেই।

از ان طرف حکم شد که هرکه بردست تو بیعت خواهد
کرد هر یک را کفایت خواهم کرد (ص—۱۶۵)-

আল্লাহ পাক সৈয়দ সাহেবকে মুরীদ করার পর এক ঘোষণার মাধ্যমে বললেন: হে সৈয়দ সাহেব! তুমি যাকে ইচ্ছে কর (হিন্দু, বৌদ্ধ) সকলকে মুরীদ করতে পার, এতে আমার সম্পন্ন সম্মতি রয়েছে।

অর্থাৎ সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী আল্লাহ পাকের হাতে মুরীদ হওয়ার পর একটি ঘোষণা দিলেন যে, আমি চিশতিয়া তরীকার পীর। যার যার ইচ্ছে এই চিশতিয়া তরীকায় বাইয়াত হতে পার! এই ঘোষণার পর পরই সর্ব প্রথম ইসমাইল দেহলভী সাহেব সৈয়দ সাহেবের হাতে মুরীদ হলেন।

আর তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন তোমরা মোজাদ্দেদিয়া তরীকা পরিহার করে চিশতিয়া তরীকার মুরীদ হও। কারণ এ চিশতিয়া তরীকার উদ্ভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক।

অতঃপর ইসমাইল দেহলভী সাহেব ওয়াজ নছিহতের ভান করে সৈয়দ সাহেবের তরীকত প্রচারের জন্য আফগানিস্থানে গমন করেন। সেখানেও তিনি এই আধুনিক তরীকত বিস্তার করতে গিয়ে আফগানী ওলামাদের হস্তে বহু নাজেহাল হন। সকলেই খোদা প্রাপ্ত তরীকতের কথা শুনে অবাক হন। কারণ আল্লাহ পাক হলেন নিরাকার তাঁর হাত পা নেই, সেক্ষেত্রে সৈয়দ সাহেব আল্লাহ পাকের হাতে কিরূপে মুরীদ হলেন? একথাটি কোন অজ্ঞ বুদ্ধিহীনও মেনে নিবে না।

আল্লাহ পাকের তরীকত বণ্টন ঃ

অতঃপর ইসমাইল দেহলভী সাহেব স্বয়ং পাগলা মনে হিন্দুস্থানের অলিগলী দেশ দেশান্তরে পর্যন্ত পৌঁছেগিয়েও তার পীর সাহেবের আধুনিক খোদা প্রদত্ত চিশতিয়া তরীকা বিস্তার করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি বঙ্গ মুখী হয়ে ১৮২০ ইং সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী সাহেবকে সঙ্গে করে কলিকাতায় উপস্থিত হন। এ উপস্থিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, মানুষদেরকে সৈয়দী তরীকত যাতাকলে আবদ্ধ করা। ঠিক সে সময় শিখদের বিরুদ্ধে তারা পীর মুরীদ দু'জনেই জিহাদ করার জন্য কলিকাতা অধিবাসীদেরকে আহবান করেন। কলিকাতার অধিবাসী মুসলিমগণ ইসমাইল দেহলভীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি শুধু শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈয়দ সাহেবের হাতে বাইয়াত নিতে চাচ্ছেন, তবে মুসলমানদের পরম শত্রুদল (ইংরেজ জাতি) তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না কেন? ইসমাইল সাহেব তদোত্তরে বললেন যে, ইংরেজ জাতি হতে আপাতত আমাদের তত

ক্ষতি হচ্ছে না। তাই আপনারা শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পীর সাহেব কেবলার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন।

ইসমাইল সাহেবের এই অগ্নিঝরা ওয়াজ শ্রবন করার পর অনেক লোক শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভীর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হন। তবে কলিকাতার কোন মুসলমান সৈয়দ সাহেবের হাতে তরীকতের বাইয়াত হন নি। আমাদের অত্র দেশের অনেক লোক ভুল ধারণা পোষণ করে চলেছেন যে, সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী সাহেবের হাতে অনেক বাংগালী মুরীদ হয়েছিল ইহা ভুল ধারণা মাত্র।

(তাওয়ারিখে আজিবা পৃঃ নং ৭০ তরিখে মাযহাবে ইসলাম লাহোর হতে প্রকাশিত ৬৬০ পৃঃ দেখুন)

ইসমাইল দেহলভী যখন সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভীকে আল্লাহ পাকের হাতে মুরীদ করে গোমরাহ করলেন তখন ভারত উপমহাদেশে শুধু মোজাদ্দেদিয়া তরীকার প্রচলন ছিল। এই তরীকার প্রধান পীর ছিলেন ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তিনি সৈয়দ সাহেবের খোদা প্রাপ্ত তরীকতের বন্টন নীতির হাল চাল দেখে বড় অসন্তুষ্ট হন।

অতঃপর শাহ সাহেব তাঁর মোজাদ্দেদীয়া তরীকার পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব ভার শাহ সূফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর উপর অর্পন করেন। সূফী সাহেব যখন কলিকাতা হতে নেজাম পুর হিজরত করে আসেন তখন তিনি এই মোজাদ্দেদীয়া তরীকার পরিচালনার দায়িত্বভার মাওলানা ফতেহ আলী বর্ধমানীর হাতে অর্পন করে আসেন। এ তরীকাটি পরবর্তিতে চলে আসে হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দীকীর নিকট।

শাহ সুফী গাজী নুর মোহাম্মদ (রহঃ) এর বঙ্গ ভারতে আগমণ ঃ

"আনউয়ারুন নিরাইন" কিতাবে আলোচিত রয়েছে যে, শাহ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর পূর্ব পুরুষগণ গজনীর অধিবাসী ছিলেন। তাদের বঙ্গ-ভারতে আগমণ উপলক্ষে একটি সুন্দর কাহিনী রয়েছে। গজনীর বাদশাহ্‌গণের মধ্যে বখ্‌তিয়ার নামক এক যুবরাজ ছিলেন। তাঁর পিতা তাকে কুতুবুল আলম নামে ডাকতেন। বাল্যকালে এই ছেলেটি পিতৃ হারা হয়ে পড়েন। মৃত্যু কালে তার পিতা তাকে তাঁর এক মামার কাছে রেখে যান এবং বলে যান যে, আমার বিষয় সম্পত্তি আপনার নিকট আমানত রইল, আমার ছেলে বড় হলে তাকে উক্ত সম্পত্তি বুঝিয়ে দিবেন।

বখতিয়ার (কুতুবুল আলম) বড় হলে নিজেই মামার নিকট বিষয় সম্পত্তি দাবী করলে মামা তাকে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। এমন কি তার উপর জুলুম করে মামা তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন।

বখতিয়ার নিরুপায় হয়ে তার পরিবার পরিজন, ছেলে ফিরুজ শাহ ও কন্যা মায়মুনা এবং অন্যান্য আরও কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে দিল্লীর সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন। সম্রাট বখতিয়ারের অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে "গৌড়" নামক স্থানের শাসন কর্তা নিযুক্ত করলেন। তিনি তার কাজে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। কিন্তু সম্রাটের বাস্তব জ্ঞানের অভাবের দরুন পরিশেষে গৌড় নামক স্থানের পতন দেখা দিল।

বখতিয়ার আবার আশ্রয় হীন হয়ে পড়লেন এবং পুত্র ফিরোজ শাহ ও কন্যা মায়মুনা এবং তার গুণগ্রাহীদের সঙ্গে করে বঙ্গ দেশের নোয়াখালী জিলার তৎকালীন "দানদিয়া" নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করলেন।

পরবর্তী সময় এখানেই বখতিয়ারের বংশধরগণ-খ্যাতি অর্জন করেন। মায়মুনাকে সেনাপতি সুজা খানের নিকট বিবাহ দেন। ফলে মায়মুনাকে কেন্দ্র করে তার বংশ বিস্তার ঘটতে থাকে।

এই বংশেরই মহামান্য পুরুষ শেখ মোহাম্মদ পানাহ হতে শেখ সুফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর জন্ম হয়। শেখ সুফী নূর মোহাম্মদের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন গজনীর অধিবাসী। আর তিনি স্বয়ং জন্মসূত্রে বাংলাদেশী।

শাহ সুফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর পূর্ব পুরুষের বংশ তালিকা ঃ

কুতুবুল আলম (বখতিয়ার)
↓ ↓
ফিরোজ শাহ (ছেলে) মায়মুনা খাতুন (মেয়ে)
↓
মিয়া মালেক (মানিক মিয়া)
↓
ইব্রাহীম
↓ ↓
শেখ বদ্দুহ (ছেলে) ও শেখ মুবারক (ছেলে)
↓
শেখ আমানুল্লাহ
↓
শেখ নাসের মোহাম্মদ
↓
শেখ মোহাম্মদ পানাহ
↓
শেখ সুফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ)

শেখ শাহ সুফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মাজার শরীফ বর্তমানে নিম্ন ঠিকানায় অবস্থিত ঃ গ্রাম ঃ মিঠানালা-সুফীয়া, ডাকঘর ঃ সুফীয়া মাদ্রাসা উপজেলা ঃ মিরস্বরাই, চট্রগ্রাম।

শেখ সূফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত শিক্ষা জীবন ঃ

শেখ সূফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রঃ) তাঁর সুশিক্ষিত পিতা 'পানাহ' এর নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এ সময় হতেই তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনের জন্য আদর্শ জীবন গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলিকাতায় যান। সে সময় কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন মাওলানা ওয়াজি উল্লাহ। এই নেকবক্ত মাওলানা ওয়াজি উল্লাহর আমলেই তিনি আলিয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন (বর্তমান কামেল)। প্রথমে তাঁর উপাধী হয় ফখরুল মোহাদ্দেসীন। তিনি যখন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন তার বহু বছর পর দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ অত্রদেশীও অনেকে ভুল করে তাঁকে দেওবন্দী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

শেখ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর বদৌলতে আমাদের এই দেশে হাদীস শিক্ষার উন্নয়ণ সাধিত হয়। হাদীস শিক্ষায় তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর হাদীস শিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি ছিল শাহ ওলী উল্লাহ ও শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) এর মত অবিকল। শাহ আবদুল আজিজ সাহেব সূফী সাহেবের তরীকতের পীর ছিলেন। তিনি যখন কলিকাতা হতে প্রত্যাবর্তন করে চট্টগ্রামের মিরের সরাইর অন্তর্গত মলিআইশে আগমণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের এক বিপুল ভান্ডার। এ থেকেই মলিআইশের সূফীয়া মসজিদে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মলিআইশই ছিল শেখ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর শেষ আশ্রয় নিবাস।

অত্র লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত আশআতুল লোমআত (ফারসী) কিতাব খানা আজও আমার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

পাক-ভারত উপমহাদেশে সুন্নী নীতিমালার তরীকত বন্টনকারী ইমামদের নামের তালিকা

(উপর হতে নীচের দিকে)

১। ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানী শেখ আহাম্মদ ছারহান্দী আল-ফারুকী (রহঃ)।
২। হযরত শেখ আদম বিন নূরী (রহঃ)।
৩। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ (রহঃ)।
৪। হযরত আল্লামা শাহ আবদুর রহীম (রহঃ)।
৫। হযরত আল্লামা শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ)
৬। হযরত আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)।
৭। হযরত মাওলানা কুতুবুল আকতাব শেখ শাহ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ)।
৮। হযরত মাওলানা কুতুবুল ইরশাদ সূফী ফতেহ আলী বর্ধমানী মোরশেদাবাদী (রহঃ)।
৯। আমীরে শরীয়ত হাদীয়ে দাওরান মাওলানা শাহ সূফী আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ)।

নোট ঃ উপরে বর্ণিত ইমামে তরীকতগণ প্রত্যেকের নীচের স্বনাম ধন্য ব্যক্তিকে ধারা বাহিক ভাবে নিজ নিজ খলিফা নিযুক্ত করেন। ৬নম্বর বর্ণিত অর্থাৎ শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী সাহেব তিনি সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীকে তরীকতের খেলাফত দেয়ার ইচ্ছে করেছিলেন

পুরো আবার রহিত করে দেন। কারণ শাহ আবদুল আজিজের জীবদ্দশায় তরীকতহীন রেলভী সাহেবই ইসমাইল দেহলভী নাম্নী খারেজী আকীদা পন্থীকে মুরীদ করেন। এবং সৈয়দ সাহেব স্বয়ং ইসমাইল দেহলভীর সহায়তায় খোদার হাতে মুরীদ হয়েছিলেন। শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) লক্ষ্য করলেন যে, সৈয়দ আহাম্মদ রেলভীকে যদি খলিফা নিযুক্ত করা হয় তবে আহলে সুন্নাতের তরীকত ও খেলাফত খারেজী খেলাফতের শামীল হয়ে যাবে। তখন তিনি রেলভীর খেলাফতকে কেটে সেই তরীকতের খেলাফতকে দিল্লী হতে বঙ্গ-ভারত মুখী করেদেন অর্থাৎ সুফী নূর মোহাম্মদ (রঃ)-কে শাহ আজিজ (রঃ) এর পীরানে তরীকতের স্থলাভিষিক্ত করেন। এই অভিমত ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম মেহেরের।

সুফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রসঙ্গে রেলভীর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন। তবে এটা বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল তাঁর। নচেৎ সুফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর মত ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত প্রখ্যাত আলেম ও ওলী উল্লাহ, সৈয়দ আহাম্মদ রেলভীর মত মূর্খ জাহেলের হাতে তরীকতের সবক নিয়ে ছিলেন কেহ বললে তা কোন অজ্ঞ ব্যক্তিও বিশ্বাস করবেনা। সৈয়দ আহাম্মদ সাহেব শুধু শরীর চর্চা বিদ ছিলেন ইহা তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল।

সৈয়দ আহাম্মদ রেলভী সাহেবের তরীকতের মাধ্যম ছিল আকর্ষিক। এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর হাতে বাইয়াত প্রাপ্ত মুরীদ। এই আজিব তরীকাপন্থীর শুধু একজন মুরীদ ছিলেন ইহজগতে-যার নাম ইসমাইল দেহলভী সাহেব। আবার তিনি ছিলেন ওহাবী খারেজী মাযহাবের আধুনিক প্রবর্তক। বড় মজার কথা হল ওহাবী তরীকত আসলে ইসমাইল দেহলভীর মাধ্যমে, আবার তাদের তরীকতের শিক্ষা বিস্তার হল হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী (রহঃ) এর মাধ্যমে। যে, তরীকত বিভিন্ন রূপে রূপায়িত হতে পারে তা, বেশী দিন টিকিয়ে থাকার কথা নয়। হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী ছিলেন ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত এবং

অন্যতম আলেম। তাঁর হাতে অনেক দেওবন্দী আলেম মুরীদ হয়ে ছিল, যখন তিনি দেখলেন তাঁর মুরীদগণ তাঁরই অনুসরণ করছেনা তখন তিনি তাঁর তরীকতের সিলসিলাটি বাতিল ঘোষণা দিয়ে মক্কায় গিয়ে অবস্থান শুরু করলেন। হাজী সাহেবের বিশেষ বিশেষ মুরীদানের মধ্যে অন্যতম মুরীদ ছিলেন মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী ও মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভী। এরা দু'জনই হাজী সাহেবের তরীকতের নীতিমালার উপেক্ষা করে চলতেন, যেমন হাজী সাহেব মিলাদে কেয়াম, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি নেক কাজকে নেক কাজ হিসেবে পালন করতেন। সেক্ষেত্রে গঙ্গুহী ও থানুভী সাহেব মিলাদের কেয়ামকে খারাপ কাজ বা বেদআতে সাইয়্যেয়াহ বলতেন। গঙ্গুহী সাহেব এত পীর বিরোধী হয়ে যান যে, হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী সাহেবের "হাপ্ত মাসায়েল" নামক কিতাব খানাকে জ্বালিয়ে দিয়ে ছিল। যার পরি প্রেক্ষিতে হাজী সাহেব গঙ্গুহীর নাম দপ্তরে তরীকত হতে কেটে দেন। তার পর হতে গঙ্গুহী সাহেব বহিষ্কৃত মুরীদ নামে আখ্যায়িত হন। থানভী সাহেব দেখলেন যে, রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী যে কারণে বহিস্কার হল সে কারণটি তার মধ্যেও রয়েছে অর্থাৎ মিলাদ শরীফকে হারাম বলা। তখন থানুভী সাহেব পীর সাহেবকে বহিস্কার করে নিজেই তরীকতের পীর হয়ে যান। এই লেংড়া লুলা তরীকত খানা আজও ওহাবীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছেন অর্থাৎ ওহাবী তরীকত খাটি লোকের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা আর রইল না। কিছু দিন পর্যন্ত থানভী সিলসিলাতে দেওবন্দীগণ আমাদের এতদ্দেশে ওহাবী তরীকত প্রচলিত রেখেছিল। তারা যখন দেখলো এই তরীকতে শান্তি নেই তখন অনেক দেওবন্দী আলেম মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (রহঃ) এর সুন্নী তরীকত ভূক্ত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাই এতদ্দেশের অনেক দেওবন্দীকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা কখনো কখনো সুন্নী সিলসিলার প্রশংসা করছেন আবার কখনো কখনো ওহাবী মতবাদকে খাটি বলছেন। তাদের একহাত বেহেশতের দিকে অন্য হাত দোযখের দিকে।

বঙ্গ-ভারতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রহঃ) এর কতিপয় প্রসিদ্ধ মুরীদানের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ

ফুরফুরার অধিবাসী জনাব হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ) (কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সনদ প্রাপ্ত) তাঁর কতিপয় বিশিষ্ট মুরীদের নাম এই ঃ

১। মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা) যাঁর ১৮ হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ ছিল।
২। মাওলানা নেছার উদ্দিন আহম্মদ (রহঃ) (শিক্ষা প্রাপ্ত কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা) বরিশালী।
৩। সূফী সদরুদ্দিন যশোরী।
৪। সূফী তাজাম্মুল হোসেন নাদীয়ায়ী।
৫। মাওলানা আহাম্মদ আলী এনায়েত পুরী।
৬। মাওলানা আবদুল মাবুদ মেদিনীপুরী।
৭। মাওলানা আবদুল জব্বার নিজাম পুরী।
৮। মাওলানা হাজী মোহাম্মদ হাতেম লালগঞ্জী।
৯। মাওলানা আবদুল মজিদ কেরওয়ারচরী।
১০। মাওলানা গোলাম রহমান নেজাম পুরী।
১১। মাওলানা আবদুর রহমান নোয়াখালী।
১২। মাওলানা মোয়েজ উদ্দিন হামীদী।
১৩। ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (বহু ভাষা বিদ)।
১৪। মাওলানা আবদুল গণি মিরেশ্বরী।
১৫। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

আরো অন্যান্য ২০০ শতেরও উর্দ্ধে তাঁর খলিফা ছিলেন। তন্মধ্যে পরস্পর উপরে উল্লেখিত দু'জনই অতি প্রসিদ্ধ। মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) যার ১৮ হাজার হাদীস শরীফ কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ওহাবী বেদআতী দেওবন্দীদেরকে লা জবাব করার জন্য ১৩৫ খানা কিতাব রচনা করেন। তৎকালে তিনি হানাফী ও মুসলিম নামক দু'খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং শরীয়ত ও সুন্নত আল জামায়াত নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ বাংলার অলিতে গলিতে পদার্পন করে জন সাধারণকে আল্লাহ এবং রাসুলের অমর বানী শ্রবণ করান।

মরহুম মাওলানা পীরে কামেল হাদীয়ে শরীয়তের ধর্মীয় খেদমত ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অবদানের ইতিহাস বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। উক্ত দু'জন আল্লামা (মহাবিজ্ঞ) আলেম হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ) এর হাতের লাঠি স্বরূপ ছিলেন। তিনি যখন বঙ্গ ভারতের যে কোন স্থানে ওয়াজ নসিহত উপলক্ষে তশরীফ নিয়ে যেতেন তাঁদের দু'জনের অন্তত একজন হলেও পীর কেবলার সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন। কারণ তৎকালে দেওবন্দী আলেমগণ পীর সাহেব কেবলার তরীকত সরাসরি বেদআত বলতো। দেওবন্দীরা ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে পীর সাহেব কেবলাকে নানা অযথা প্রশ্ন করতো। সেক্ষেত্রে মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) দেওবন্দীদের প্রশ্নের খন্ডন করতেন। কারণ তিনি ছিলেন হাফেজে হাদীস। তাঁর প্রশ্ন খন্ডন দেখে অনেক স্থানে অনেক দেওবন্দী আলেম পীর সাহেব কেবলার হাতে বাইয়াত হয়ে যান। সে জন্য ভারত ও বাংলাদেশে অনেক দেওবন্দী আলেম হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ) ও মাওলানা রুহুল আমীন ও মাওলানা নেছার উদ্দিন (রহঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর সঙ্গে দেওবন্দি ওহাবীদের বহছ ও মোকাবিলা ঃ

বহছ ও মোনাজিরার প্রচলন আদিকাল হতে চলে আসছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের সঙ্গে বহছ করেছেন, যার কথা কোরআনে উল্লেখ আছে। হযরত আদম (আঃ) হযরত মুসা নবীর সঙ্গে তর্ক বহছ করেছিলেন। ইহা বোখারী শরী শরীফে উল্লেখ আছে। হুজুরে পাক (দঃ) খৃষ্টানদের সংগে বহছ করেন, যার কথা তাফসীরে কবিরের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত রয়েছে।

তৎকালে দেওবন্দী ওহাবীদের উৎপাত বেশী ছিল। যখন কোন সুন্নী আলেম কোথাও ওয়াজ নছিহতের জন্য আগমণ করতেন তখন দেওবন্দী ওহাবী মৌলভীগণ সদলবলে সেস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। অনেক স্থানে হানাফী সুন্নীপন্থীগণ তর্ক বহছে হেরে গিয়ে ওহাবী মাযহাবে চলে যেতেন। আল্লাহ পাকের মর্জিতে শ্রদ্ধেয় মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে বের হওয়ার পর ওহাবীদের উৎপাত বন্ধ হয়ে যায়। বহু স্থানে ওহাবীগণ পরাস্ত হয়ে সুন্নী আকীদায় বিশ্বাসী হন।

১। মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) এর সঙ্গে মৌলভী গোলাম রহমান দেওবন্দী সাহেব মিলাদ কেয়াম নাজায়েজ বলে সাতক্ষীরার অন্তর্গত মাহমুদপুর গ্রামে বহছের তারিখ ধার্য করে। কিন্তু মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব যখন মাহফিলে ঠিকমত পৌঁছে যান, তখন মৌলভী গোলাম রহমান পথ হতে কেটে পড়েন। যখন দেওবন্দী সাহেবের বাড়ীতে খোজ নেয়া হল তখন বলা হল যে, তিনি বহছ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। কিন্তু তখন তিনি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন।

২। মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) দ্বিতীয় বহছ করেন সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা নিবাসী ওহাবী মৌলভী হাসিব উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে। ওহাবী সাহেব বলতেন কেয়াছ শরীয়তের দলিল নয় এবং ৭০ ফের্কার হাদীসটি অশুদ্ধ। এ বহছে ওহাবী সাহেব শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করেন এবং জনসাধারণের সম্মুখে ওয়াদা করেন যে, উপরে উল্লেখিত মত পোষণে তার ভুল হয়েছে। তিনি আর কখনও এরূপ মত পোষণ করবেন না।

৩। সিরাজগঞ্জ নিবাসী দেওবন্দী আলেমগণ বলতেন মিলাদে কেয়াম নাজায়েজ এবং গ্রামে জুমার নামাজ পড়া নাজায়েজ। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব যখন প্রস্তাবের বিপক্ষে দলিল প্রমাণ সহকারে যুক্তির অবতারণা করেন তখন দেওবন্দীগণ নিরোত্তর হয়ে যান এবং তওবা পড়ে তার হাতে মুরীদ হন।

মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) তিনি দেওবন্দী ওহাবী লা-মাযহাবী ভন্ডপীর ইত্যাদির সঙ্গে অন্তত ১০০ এর মত বহছ করেছিলেন। প্রত্যেক বিরোধীদল তখনই পরাস্ত হয়েছিল। আমি এখানে বহছ সমূহের পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম না। (মাওলানা রুহুল আমিন পুস্তকের ৬৪ হতে শেষ পর্যন্ত দেখুন)

একবার মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) চট্টগ্রাম হাটহাজারী খারেজী মাদ্রাসার সন্নিকটে এক বিরাট ওয়াজ মাহফিলে হাজীর হন। সেই মাহফিলে হাজার হাজার জ্ঞানী-গুণী আলেম-ওলামা উপস্থিত ছিলেন। হাটহাজারী খারেজী মাদ্রাসার ওহাবী আলেমেরা মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ)-কে দেখতে এবং তাঁর ওয়াজ শ্রবণ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ দেখে ঘৃণা মূলক মনোভাব পোষণ করেন ও নানারূপ উক্তি করে বলেন যে, এই লোক বাংলা বিখ্যাত মাওলানা হতে পারেন না! মনে হয় তাঁর তেমন এলেমও নেই!

বাদ মাগরিব মাওলানা রুহুল আমিন অনর্গল হাদীস দ্বারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়াজ করতে থাকেন, তখন হাটাজারী মাদ্রাসার খারেজী মৌলভীগণ তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

একবার মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) সিলেট গৌরী পুরে ওয়াজ করতে যান। সেখানে দেওবন্দী আলেমগণের বড় প্রভাব ছিল। সকল দেওবন্দীগণ একত্রিত হয়ে মাওলানা সাহেবকে ওয়াজের মধ্যে আটকাবার উদ্দেশ্যে বারংবার প্রশ্ন করতে থাকেন। মাওলানা সাহেব বললেন ওয়াজ শেষে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে। তবে দেওবন্দী আলেমগণ তাঁর কথা মানলেন না। তখন মাওলানা সাহেব উপস্থিত জনতা হতে এজাজত নিয়ে দেওবন্দী আলেমগণকে বললেন, আপনারা মিলাদকে হারাম বলছেন, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি আপনারা প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ)-কে মানেন, তাহলে তাঁর বৈশিষ্ট্য মূলক দু'টি হাদীস বলেন ? কিন্তু কোন দেওবন্দী আলেম তাঁর একটি হাদীসও মুখস্ত বলতে পারলেন না। অতঃপর মাওলানা সাহেব হুজুরে পাক (দঃ) এর শানে এক ঘণ্টা পর্যন্ত অনর্গল উপস্থিত জনতাকে মুখস্ত হাদীস শুনালেন। শেষ পর্যন্ত দেওবন্দী আলেমগণ মাওলানা সাহেবের হাতে বায়াত হন এবং তওবা পড়েন। এই আলোচনা সভাকে গৌরী পুরের বহছ নাম দিয়ে পুস্তক ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

সৈয়দ আহাম্মদ বেরেলভী শহীদ হয়েও কেন শহীদ নন

সৈয়দ আহাম্মদ বেরেলভী নিঃসন্দেহে বালাকোটের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তবে দেওবন্দীগণ তাঁর এই শাহাদাত বরণকে মেনে না নিয়ে নিজেদের মধ্যে এই গুজব রটায়ে রেখেছেন যে, সৈয়দ সাহেব আজও জীবিত আছেন। জনাব আশরাফ আলী থানভী সাহেব স্ব-রচিত পুস্তক এমদাদুল মুশতাক এর ৭১ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনে সিল মহর দিয়ে লিখে রেখেছেন।

الول : ایک بزرگ نے حضرت سید صاحب کو بعد شہادت دیکھا۔

অর্থাৎ সৈয়দ আহাম্মদ বেরেলভী (রহঃ) কে থানভী সাহেবের কোন বিশ্বস্ত মুরীদ তাঁর শহীদ হওয়ার পরেও জীবিত দেখেছেন। ইহা ছাড়া দেওবন্দীগণের ধারণা যে, তিনি অনেক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও জীবিত আছেন। তিনি পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করছেন। তিনি যুদ্ধে শহীদ হন নি বরং যুদ্ধের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে পাহাড়ের মধ্যে আত্ম গোপন করে রয়েছেন। মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেব থানভীর মুরীদের কথার উপর আস্থাবান হয়ে সৈয়দ সাহেবকে নিজেদের মধ্যে উপস্থিত করতে পারবেন এই মর্মে অনেক দেওবন্দী হতে চাঁদা তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও সৈয়দ সাহেবকে উপস্থিত করাতে পারলেন না।

ভারত উপমহাদেশের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম রসূল মেহের বলেন اسکی موت اور شہادت کا کوئی مکمل فیصلہ نہیں ہوں کہا جا سکے সৈয়দ সাহেবের মৃত্যু ও শাহাদত কোনটার সঠিক দিক নির্ণয় করা যাচ্ছেনা। (سیرت سید احمد)

তদ্রূপ ইসমাইল সাহেব সম্বন্ধে দেওবন্দীগণ প্রবাদ রূপে প্রসিদ্ধ করে রেখেছেন। ইসমাইল শহীদ, অথচ ইতিহাস তা বলেনা। হাজারা জেলার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিজস্ব রচিত "تاريخ هزاره" তারিখে হাজারা" এর মধ্যে লেখেন যে, ইসমাইল সাহেব মুসলমানদের হাতে নিহত হন।

কথিত আছে যে, পাঠান কোটের ইউসুফ জর্গা জয়ী সে শিখ সম্প্রদায় এর সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য বহু সংখ্যক বন্দুক যোদ্ধা তৈরী করে ঠিক সে সময় ইসমাইল দেহলভী সাহেবের সৈন্যবাহিনী পাঠান রাজ্যে উপস্থিত হয়। পাঠান খান্দানের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, নিজেদের মেয়েদেরকে দেরী করে বিবাহ দিত। ইসমাইল সাহেব এই বদ প্রথা রহিত করণের উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান জারি করলো যে, সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভীর কোন মুরীদের মেয়ে অবিবাহ থাকতে সে তার বাহিনীর সঙ্গে থাকতে পারবেনা। এই বিধান জারী হওয়ার পর পাঠান খান্দানের ২০টি অবিবাহিত মেয়েকে পাঞ্জাবী বাহিনীর ২০ জনের সঙ্গে বিবাহ পড়ায়ে দেন এবং দুটি মেয়ের সঙ্গে স্বয়ং ইসমাইল সাহেব বিবাহ পড়েন। ইউসুফ জর্গাজয়ী এই বিবাহ রীতি নীতি দেখে সন্দেহ পোষণ করেন যে, প্রকৃত পক্ষে ইহাতো কোন শরীয়তের বিধান নয়। বরং ইসমাইলের কুমতলব। ইউসুফ জর্গাজয়ী বলে ফেললেন, আমরা আপনার শরীয়তের বিধান মানিনা, আমরা আমাদের মেয়েগুলো ফেরৎ পেতে চাই। কিন্তু ইসমাইল সাহেব তাদের মেয়ে ফেরত দিতে অস্বীকার করলে পাঠান ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। প্রথম দিন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের কোন ফলাফল হয় নাই। পরদিন ইউসুফ জর্গাজয়ী ইসমাইলকে লক্ষ্য করে গুলি মারলে ইসমাইল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটে পড়ে। ইসমাইল সাহেবের মৃত্যু দেখে পাঞ্জাবীগণ সৈয়দ বাহিনী ত্যাগ করে চলে যায়। (তারিখে হাজারা ৫১৯ পৃষ্ঠা ফরিয়াদুল মুসলেমিন ১৮ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন ইতিহাস পুস্তকের মধ্যে দেখা যায় যে, ইসমাইল সহেব মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। অথচ দেওবন্দীগণ তাকে শহীদ নামে আখ্যায়িত করেন। আবার যিনি প্রকৃত শহীদ (সৈয়দ সাহেব) তাঁকে শহীদ বলা দূরের কথা দেওবন্দীগণ তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন না। যিনি বালা কোটের ময়দানে শহীদ হন তাকে শহীদ বলতে চান না। আর যে যুদ্ধ ময়দানের ধারে কাছে ছিলনা সে শহীদ হল কি করে ?

অতি সত্য কথা যে, দেওবন্দের মধ্যে ওহাবী মাযহাব বিস্তারে ইসমাইল দেহলভীর বিরাট অবদান রয়েছে তবে কেহ তার বা সৈয়দ সাহেবের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে না। সকল দেওবন্দীগণ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী সাহেবের কাছে মুরীদ হলেন কেন ?

তরীকা ঃ আওর মোহাম্মদিয়া

ভারত উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ তরীকত প্রবর্তক ইমামে রব্বানী আল্লামা মোজাদ্দেদে আলফে সানীর নির্ধারিত মোজাদ্দেদিয়া তরীকার উপর সকল তরীকত পন্থীগণ তরীকতের সিলসিলা কায়েম করেছেন। কেহ আজ পর্যন্ত উক্ত প্রবর্তিত তরীকতের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেনি। কারণ মোজাদ্দেদিয়া তরীকা এক নামে প্রসিদ্ধ হলেও বহু তরীকার সমষ্টি। যদি কোন ব্যক্তি মোজাদ্দেদিয়া তরীকার বাইয়াত হল সেক্ষেত্রে বলা হবে যে, সেই ব্যক্তি সব তরীকার বাইয়াত হল। আমাদের এতদ্দেশের তরীকত পন্থী পীরগণ তরীকত গ্রহণ কালে উচ্চারণ করে থাকেন, যেমন বলেন চিশতিয়া নকশবন্দীয়া সোহরাওয়ারদিয়া এবং মোজাদ্দেদিয়া তরীকার উপর বাইয়াত হলাম।

আর অনেক পীরানে তরীকতগণ শুধু মোজাদ্দেদিয়া তরীকার নামে

বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন। উপরে উল্লেখিত দুই পদ্ধতির মাধ্যমে বাইয়াত গ্রহণ করা সঠিক। এই সঠিক তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আলীয়া মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষার সনদ প্রাপ্ত আল্লামা আবুবকর সিদ্দিক, মাওলানা রুহুল আমীন ও আল্লামা নেছার উদ্দিন আহাম্মদ প্রমুখ। এরা নিসার্থক ভাবে এতদ্দেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করে গেছেন। এ ছাড়া তাঁরা আওলীয়ায়ে কেরামদের তরীকত পদ্ধতির পূর্ণ অনুসরণ করে গেছেন। সেই তরীকায় "আওর মোহাম্মদীয়া" বর্দ্ধিত বাক্যটি নাই।

চারি তরীকা বা আরো ভিন্ন তরীকা সমূহের উপর 'আওর মোহাম্মদিয়া বাক্যটি যুক্ত করার দ্বারা তরীকত পন্থীগণের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, এই বহুমুখী তরীকার প্রকৃত মুখ কোন দিকে। তরীকতের মধ্যে হেরফের পরিবর্তন পরিবর্ধন করা কোন পীরের ক্ষমতার আওতাধিন নয়। কারণ তরীকতের সকল কাজ তরীকত সংস্কারকের উপর পূর্ণ অর্পিত থাকে। যদি কোন তরীকত পন্থী তরীকতের মূল বাক্যের উপর কোন বাক্যের সংযোজন করেন তখন সেটি আর তরীকত রইলনা বরং সেটা তরীকত চুরি বা জালিয়াতী। এই সংমিশ্রণ যেমন চিনির সাথে লবনের মিশ্রন।

আর যদি কোন পীর সাহেব বলেন ঃ "আওর মোহাম্মদিয়া" বাক্যটির দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল যে, আমি মোহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র নামের বরকত হাসিল করব। তখন প্রশ্ন উঠে যে, তরীকতের সিলসিলা কায়েম করার জন্য প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর পবিত্র নাম মোহাম্মদকে ব্যবহার করার শরীয়তের কোন নির্দেশ আছে ? যদি শরীয়তের নির্দেশ না থাকে তা হলে এটা তরীকত জালিয়াতী ছাড়া আর কি ?

আমরা সাধারণত দেখছি যে, যে তরীকত প্রবর্তকগণ নিজ নামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তরীকতের নাম রেখেছেন, যেমন হযরত আবদুল কাদের (রহঃ) এর তরীকতের নাম ছিল তরীকায়ে কাদেরীয়া। আর তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আওলীয়া, সে ক্ষেত্রে প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ) হলেন

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক বা বানী। যদি তরীকতের সঙ্গে আওর মোহাম্মদ বাক্যটি ব্যবহার করা হয় তখন এই সংযোজন ধর্ম অবমাননাকর কার্য না হলে আর হবে কি ?

আর যদি বলা হয় যে, আওর মোহাম্মদিয়া বাক্য দ্বারা যদি সরাসরি মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর তরীকাকে উদ্দেশ্য করা হয়। তখন বলা হবে যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর মোহাম্মদিয়া নামের কোন তরীকা ছিল বলে আমরা কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে আজ পর্যন্ত দেখি নেই। বরং তাঁর জন্য রয়েছে কুফর মতবাদের পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম। ধর্ম আর তরীকা দুটি এক কথা নয়।

আর যদি বলা হয় যে, আওর মোহাম্মদিয়া বাক্য সংযুক্তির দ্বারা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তখন বলা হবে যে, উক্ত মুহাম্মদ তো ধর্ম প্রতারক ছিল তারতো কোন তরীকা ছিলনা। এই মুহাম্মদতো মুসলিম উম্মার ঐক্যমতে কাফের ও প্রতারক ছিল। যার কোন ধর্ম ছিলনা সে আবার ধর্ম সংস্কারক হল কখন হতে ? তবে দেওবন্দী আলেমগণ তথাকথিত মুহাম্মদকে ধর্ম সংস্কারক নামে আখ্যায়িত করেন।

কবর বা স্মৃতি সৌধ নির্মাণের বিধান

মানব জাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে কবরস্থ করার নির্দেশ কোন ধর্মে ছিলনা। তাই যে কোন যুগে মানুষ জাতি মৃত্যু বরন করলে স্বসম্মানে কবরস্থ করা হয়ে থাকে। নিজ নিজ তাওফীক অনুযায়ী কবরস্থ ব্যক্তির কবরকে পাকা পোক্ত করা হয়। অপারগ হলে অন্তত কবরের উপর স্মৃতি স্বরূপ একটি পাথর রেখে দেয়া হয়। এরূপ ভাবে পূর্বকালে আম্বিয়া

আওলীয়া কেরামদের কবর গুলো সংরক্ষণ করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন বায়তুল মোকান্দাস বিজয় উপলক্ষে সেখানে গমণ করে দেখেন যে, আম্বিয়া আওলীয়া কেরামদের কবরের উপর নির্মিত স্মৃতি সৌধগুলো আজও ঝকঝক করতেছে। তিনি স্বদেশে ফিরে উক্ত স্থানের নির্মিত স্মৃতি অনুপাতে মদীনার ভূমিতে কতিপয় কবর স্মৃতি নির্মাণ করেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খেলাফত আমল হতে ১৪শত বছর অতিবাহিত হয় এতে কেহ দ্বিমত পোষণ করেন নাই।

বর্তমানে একদল ধর্মদ্রোহী জ্ঞানী বের হয়েছে যাদেরকে নজদী ওহাবী বলা হয়। তারা কবর পাকা করা এবং কবরের উপর স্মৃতি নির্মাণ করাকে হারাম বলে। 'ইবনে কায়েম' একজন ওহাবী ইমাম ছিল, সে প্রকাশ্য মন্তব্য করে যে, কবর পাবা করা ও স্মৃতি নির্মাণ করা শিরিক ও বেদআত। ইমাম সাহেব এ মন্তব্যও করেছেন যে, যদি কেহ ঘটনা চক্রে কবর পাকা করে ফেলে তাহলে সেই কবরকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব। এই তথাকথিত ইমামের রায়ের পূর্ণ কার্যকারীতা শুরু হয় যখন নজদী পন্হীগণ হিজাজ ভূমি আক্রমণ করে। তখন হতে তারা মক্কা ও মদীনার পূর্ব প্রতিষ্ঠিত পাকা কবর সমূহকে এক এক করে ভেঙ্গে শেষ করে দেয়। ইসলামী আদর্শের প্রামাণ্য চির প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) এর আত্ম গোপনের স্থানটিকে একেবারে বিনষ্ট করে ফেলে। কুফায় অবস্থিত হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর মাজারকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলে। অতঃপর সাহাবী, তাবেয়ী ও আওলীয়াদের নিদর্শনাবলীকে ধ্বংস করার প্রতি এত ক্ষিপ্ত হয় যে, তারা আজ পর্যন্ত মক্কা ও মদীনার ভূমিতে একটি পাকা কবরের স্মৃতি পর্যন্তও বিদ্যমান রাখে নাই।

মাজার নির্মাণের পটভূমিকা ঃ

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, আমি যখন দেশ বিজয় অভিযানে লিপ্ত ছিলাম তখন আমার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার সুযোগ লাভ হয়েছিল। তবে বায়তুল মোকান্দাস বিজয় অভিযানে আমি হযরত আবু ওবাইদা (রাঃ) কে সেখানে প্রেরণ করি। আমি তাঁকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নির্দেশ দিলাম যে, তুমি সর্ব প্রথম বায়তুল মোকান্দাস পৌঁছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দাওয়াত প্রদান করবে যদি তারা দাওয়াত অমান্য করে তবে তাদের চতুর্দিকে বেষ্টনী দিয়ে রাখবে। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর নির্দেশ মোতাবিক প্রথম বায়তুল মুকান্দাস বাসীদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পেশকরেন। স্থানীয় অধিবাসীরা হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) কে বলল, আমরা এক শর্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে ইচ্ছুক, তা এই যে, স্বয়ং খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে আমাদের বায়তুল মোকান্দাস শহরে পদার্পন করতে হবে। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) এই শর্তের খবরটি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর কানে পৌঁছায়ে দেন। এই খবর পেয়ে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে স্বয়ং বায়তুল মোকান্দাসের দিকে রওয়ানা দেন। বায়তুল মোকান্দাসের অধিবাসীরা খলিফাতুল মুসলেমীনের শুভাগমণে উৎফুল্ল হয়ে বলল আমরা সকলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলাম। আপনি আমাদেরকে ইসলামী কালেমা পাঠ করান।

অতঃপর খলিফাতুল মুসলিমীন মদীনার পথে রওয়ানা দেওয়ার পূর্বে প্রথম মসজিদ "আকসা" পরিদর্শন করেন। ইহা ১৬ হিজরীর ঘটনা।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কর্তৃক বায়তুল মেকাদ্দাস পরিদর্শন

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শনের কাহিনীটি বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ বদরুস্ সারীতে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপি বদ্ধ করলাম। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) যখন বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শন করতে গমন করেন তখন দেখেন যে, উহার চতুর্দিকে হাজার হাজার আম্বিয়া কেরামদের কবর মাজার বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে রয়েছে। ইহা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান! আর বলেন আমিই সৌভাগ্যবান, কারণ আমারই প্রথমে আম্বিয়া আওলীয়াদের কবর জিয়ারত করার সৌভাগ্য ঘটেছে। এই বলে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ কবর স্থান অর্থাৎ বায়তুল খলিলে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে প্রথমে তাঁর দৃষ্টি গোচর হল হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সংরক্ষিত কবর সমূহ। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আবেগ ভরা মনে উক্ত কবরস্থানের মাজার সমূহ জিয়ারত করলেন। তিনি জিয়ারত করার সময় মাজার সমূহের দৃঢ় নির্মাণ পদ্ধতি অবলোকন করে অবাক হয়ে পড়লেন। কারণ কবরের উপর নির্মিত পাকা পোক্ত স্মৃতি সৌধ সমূহ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আজও নতুন নির্মাণ রূপে ঝকঝক করছে। কবরের নির্মাণ কার্য্য দেখে তিনি মনে করলেন যে, প্রত্যেক আম্বিয়ায়ে কেরামদের আমলে কবর পাকা করা এবং কবরের উপর স্মৃতি সৌধ নির্মাণের ধারা প্রচলন ছিল।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কবর পাকা করা এবং কবরের উপর স্মৃতি সৌধ নির্মাণ সম্বন্ধে হুজুরে পাক (দঃ) আপনাকে বিশেষ ভাবে কোন নির্দেশ দিয়েছেন কিনা ?

হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর প্রশ্নের জবাবে এ বলে উঠলেন যে, হুজুরে পাক (দঃ) আমাকে দু'টি নির্দেশ দেন প্রথম নির্দেশটি হল যে, মদীনার সড়কের পার্শ্বে কাফের মুশরিক কর্তৃক যত দেবদেবী ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে উহাকে সমূলে ধ্বংস করে দাও।

দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল যে, মদীনায় যত মুসলমানদের কবর সমূহ বেযত্নে এবং অবহেলিত ভাবে রয়েছে উহাকে সমুন্নত ও সংরক্ষণ করার। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) বলেন ঃ

عن علی (رض) قال قال : ان لا ادع تمثالا الا طمسته
ولا قبرا مشرفا الا سويته — (صحيح مسلم - ترمذی
نسائی باب تسوية القبور .

এই হাদীসটির মধ্যে কবর সমতল করার যে নির্দেশ রয়েছে উহা দ্বারা কবরকে সমুন্নত করা এবং সংরক্ষণ করা উদ্দেশ্য। সমুন্নত করার বিশেষ উপায় হল কবরকে পাকা করা এবং উহাকে বেষ্টনী দিয়ে সংরক্ষণ করা।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর কবর নির্মাণের বক্তব্য শুনে হযরত আলী (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন যে, মদীনার মুসলমানগণের কবরকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করুন।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক মদীনার সাধারণ কবর সমূহকে নিশানা যুক্ত করে সংরক্ষণ শুরু করলেন। প্রথমে নির্মান করলেন প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর রওজা শরীফ। এই সময় প্রিয় নবীর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) জীবিত ছিলেন।

একদা অনাবৃষ্টিতে মানুষ অস্থির হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি পরামর্শ দেন যে, রাসূলে পাক (দঃ) এর নির্মিত রওজার কোব্বা শরীফের উপরি ভাগের যে কোথায় সামান্য ছিদ্র করে অতঃপর তাঁকে উসিলা করে দোয়া করলে মনের বাসনা পুরো হবে।

আমাদের এতদ্দেশীয় একদল দেওবন্দী ওহাবী আলেম বলেন যে, কবর নির্মাণ করা, কবর পাকা করা এবং কবরের উপর কোববা নির্মাণ করা বেদআত। কারণ তারা বলে যে সব কাজ নবী ও সাহাবীগণের যুগে পালন করা হয় নি উহা বেদআত হওয়ার কারণে শরীয়ত সম্মত নয়। আমি অজ্ঞ দেওবন্দীগণকে জিজ্ঞেস করি যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) কি সাহাবী ছিলেন না? প্রকৃত পক্ষে কোববা নির্মাণ করা এবং কবর পাকা করা সাহাবায়ে কেরামদের আমল হতে শুরু হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) যত দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর রওজা শরীফে যা পাকা ঘর রূপে ছিল উহাতে অবস্থান করেন। মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর পার্শ্বের তাঁর নির্দিষ্ট কবরের স্থানটি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে দান করে স্বয়ং তিনি জান্নাতুল বাকীর সুপ্রসিদ্ধ কবরস্থানে সমাহিত হন।

নজদীগণ মদীনার কবর সমূহের মধ্যে অন্যতম কবর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর কবরকে সমূলে ভেঙ্গে চুরে কবর ভাঙ্গার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। নজদীগণের কবর ভাঙ্গার ঘৃণিত কার্যটি মক্কার কাফিরদের কুকীর্তী হতে অধিক অথারিত্ত। কাফের-মুশরিকগণ বহু অপকর্মে লিপ্ত হত তবে কখনো কোন মুসলমানদের কবর ভাঙ্গে নাই। কাফেরগণ হুজুরে পাক (দঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদীনার সংনিকট আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে দেখে নবীর মাতার কবর। তারা বিবি আমেনার কবর খানাকে সম্মান না করলেও অন্তত ভেঙ্গে ফেলে দিতে পারত তবে ভাঙ্গে নি। কিন্তু নজদীগণ নবী সাহাবীদের কবর সমূহকে আজ পর্যন্ত নির্বিচারে ভাঙ্গা শুরু করেছে।

পাকা কবর ও স্মৃতি নির্মাণের মূল উৎস

কবর পাকা করা এবং কবরের উপর ঘর নির্মাণ করার মূল উৎস হল আল্লাহ পাকের কোরআন এবং রাসূলে পাক (দঃ)-এর হাদীসের নির্দেশ। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এই বিষয় কোরআনের নির্দেশাবলীর প্রতি লক্ষ্য করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) এর হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। উক্ত দু'খলিফাতুল মুসলেমীনের আমলে কবর পাকা করা এবং স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সূচনা হয়।

কোরআন পাকের মধ্যে "আসহাফে কাহাফের' ঘটনায় কবর পাকা করার নির্দেশ এবং স্মৃতি নির্মাণের কথা পরিস্কার শব্দে উল্লেখ আছে। যেমন:
أبنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم لنتخذن عليهم مسجدا । (الكهف ٢١) আসহাফে কাহাফ বলা হয় পূর্ব যুগের এক বাপের ৬টি সন্তানকে, যাঁরা "দাকয়ানুস" নামক (খোদায়ী দাবীদার) বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করে বন্দি হয়ে ছিলেন। দাকয়ানুস এই ৬ সন্তানকে গ্রেফতার করে একটি পাহাড়ের গর্তে বন্দি করে। তারা দীর্ঘ কাল বন্দি খানায় অবস্থান করে মৃত্যু বরণ করেন। আল্লাহ পাক তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে মৃত্যু বরণের স্থানটির উপর ঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন।

আল্লামা যমখশরী বলেন, আসহাবে কাহাফের মৃত্যুর স্থানটিকে পাথর দ্বারা বেষ্টনী করে সংরক্ষণ করার নির্দেশটি ঘর নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। যেমন প্রিয় নবী (দঃ) এর কবরকে বেষ্টনির সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় আয়াতটির মধ্যে আসহাবে কাহাফের মৃত্যুর স্থানে মসজিদ নির্মাণের মূল লক্ষ্য ছিল যে, তাঁদের ভক্ত বৃন্দগণ যখন সেখানে উপস্থিত হবেন নামায দোয়া পাঠ করে সেই পবিত্র স্থান হতে যেন বরকত উপলব্দি করতে পারে।

উক্ত দু'টি আয়াত দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, পূর্ব যুগে কবর পাকা করা এবং কবরের উপর ঘর নির্মাণ করার প্রচলন ছিল। বায়তুল মোকাদ্দেসের মধ্যে অবস্থিত আম্বিয়া (আঃ) ও আওলীয়ায়ে কেরামদের পাকা কবর ও স্মৃতি সৌধ নির্মাণ সম্বন্ধে স্বয়ং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, পূর্ব যুগের কবর নির্মাণের স্বরূপ উক্ত নির্মাণ ধারায় ছিল। এ ধারা মোতাবেক তিনি নিজ আমলের সাহাবায়ে কেরামদের কবর, মাজার নির্মাণ করে গেছেন। তাঁর নিজ পক্ষ হতে কোন নতুন কবর, মাজার নির্মাণের নিয়ম প্রনয়ণ করেন নি।

আর হযরত আলী (রাঃ) প্রিয় নবী (দঃ) এর নির্দেশের উপর আমল করেছেন। তিনি দু'টি বস্তু সম্বন্ধে নির্দেশিত ছিলেন। ১। মক্কা মদীনার সড়কের ধারে ধারে কাফের মুশরিক কর্তৃক নির্মিত দেবদেবী ও প্রতিমা সমূহকে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করার।

আর মক্কা মদীনায় যতগুলো মুসলমানদের কবর রয়েছে উহাকে ইসলামী নিদর্শন হিসেবে সমুন্নত করার। মোসলমানগণের প্রতিষ্ঠিত কবর সমূহকে সমুন্নত করার বহু তরীকা রয়েছে। যেমন যে সব কবর আঁকা বাঁকা রয়েছে উহাকে সোজা করে দেয়া। মানুষ যখন লম্বা গঠনের তাই মানুষের কবরকে গোলাকার না করে লম্বা করা। পূর্ব যুগে কবর সমূহ উটের পিঠের মত করে গোলাকার করে নির্মান করা হত। ইসলাম ধর্মে গোলাকার কবরের পরিবর্তে মুসলমানগণের কবরকে লম্বা সমতল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সমতলের সীমা হল কবরকে সরজমিন হতে আধা হাত পরিমাণ উঁচু করা। আর কবরের উপর যদি কোব্বা নির্মাণ করা হয় তবে উহাও কবরের সোজা উপরের দিকে উঁচু করা।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা, কবরকে পাকা করা এবং কবরের পার্শ্বে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার এই নির্দেশের বিপক্ষেও একটি নির্দেশ দেখা যায়। যেমন ঃ

ما روى عن النبي (ص) قوله لعن الله اليهود والنصارى
اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا - (بخارى)

অর্থাৎ হযরত নবী করীম (দঃ) বলেন, ইহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহ পাকের লানত, যারা স্ব-স্ব নবীদের কবর সমূহকে মসজিদ রূপে ব্যবহার করতো। পক্ষান্তরে এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা এবং সেই ঘরকে মসজিদ রূপে ব্যবহার করা শরীয়ত সম্মত নয়।

উত্তর ঃ ইসলামের পূর্ব যুগে ইহুদী নাসারাগণ স্ব-স্ব নবীর কবরের উপর স্মৃতি সৌধ বা ঘর নির্মাণ করতো ইহা তাদের দৃষ্টান্তমূলক অপরাধ ছিলনা। বরং তাদের অপরাধ ছিল যে, তারা আম্বিয়াদের কবরকে কেবলা করতো এবং সেই কবরকে সিজদা করতো। কোন যুগেই কবর সিজদা করা শরীয়ত সম্মত ছিলনা। যেমন ইসলাম ধর্মে কবর সিজদা করা হারাম। তবে যে মসজিদের মধ্যে মাজার রয়েছে সেখানে গমন করলে এক সাওয়াবের জায়গায় দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়। প্রথম সাওয়াবটি হল মসজিদে নামাজ পড়ার। দ্বিতীয় সাওয়াবটি হল কবর জিয়ারত করার।

প্রশ্ন ঃ কবরের পার্শ্বে নামাজ পড়লে কবরকে সিজদা করা হয় এই যুক্তিতে মাজার ও দরগাহকে ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ ?

উত্তর ঃ শিরকী কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণতঃ মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়াতেও রয়েছে। কেননা কবর বা কবরের ঘর যে সব বস্তু দ্বারা নির্মিত, মসজিদও ঐসব বস্তু দ্বারা নির্মিত। প্রশ্নকারীর সম্ভাব্য প্রশ্নের ভাষা অনুপাতে মসজিদে নামাজ পড়াও শিরকী কাজ। কেননা মুসল্লি যখন মসজিদে নামাজ পড়েন তখন সে তার সামনের প্রতিষ্ঠিত ইটপাথরের মেহরাব ও দেয়ালকে সিজদা করছে উহা প্রকাশ্য শিরক।

তদুপরি সে যদি ইমাম সাহেব দ্বারা নামাজ কায়েম করে তাহলে সে প্রথমে ইমাম সাহেবকে সিজদা করছেন। কারণ ইমাম সাহেব মুসল্লিদের পিছে নাই। বরং তিনি মুসল্লিদের সামনে রয়েছেন। যদি খাটি করে শিরিক মুক্ত নামাজ পড়তে হয় তাহলে প্রশ্নকারীর ভাষ্যমতে ইমামকে মুসল্লিদের পিছে রেখে নামাজ পড়তে হয়। ইমাম সাহেব হলেন নামাজের পরিচালক। আর পরিচালক সব সময় পিছনে থাকেন। যেমন রাখাল গরু-ছাগলের বাতানের পিছনে থেকে বিভিন্ন বাক্য দ্বারা স্বচক্ষে দেখে নির্দেশ করে। তদ্রূপ ইমাম সাহেব মুসল্লিদের পিছনে থেকে নামাজ পরিচালনা করলে ক্ষতি কি ?

কবরের পার্শ্বে নামাজ পড়ার বিধান

প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর রওজা শরীফ নির্মানের পর হতে যুগ যুগ পর্যন্ত রওজার পার্শ্বে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় নামাজ পড়ে আসছেন। রওজা শরীফ সংলগ্ন "বেহেশতের টুকরা" নামক একটি পবিত্র স্থান রয়েছে যার মর্যাদা আল্লাহ পাকের আরশের চেয়েও বেশী। এই রূপ পবিত্র স্থানে নামাজ পড়া ও দোয়া করা সুন্নত। তৎকালের ধর্মপ্রাণ আশেকে রাসুলগণ দলে দলে আগমণ করে তথায় নামাজ দোয়া দরুদ সালাম পাঠ দেখে একজন নজদী পন্থী (ইমাম ইবনে তাইমিয়া) একটি ফতোয়া রচনা করে মন্তব্য করেন যে, কবরের পার্শ্বে নামাজ পড়া হারাম।

বর্তমান যুগের নজদীগণ রওজার পার্শ্বে কাউকে নামাজ পড়তে দোয়া করতে দেখলে "কুফর, হারাম—কুফর, হারাম" বাক্য উচ্চারণ করে জিয়ারতকারীগণকে তথা হতে বিতাড়িত করে দেয়। (নাউজুবিল্লাহ)

এই শয়তান ইমাম 'জিয়ারত কুবুর' নামক কিতাবের মধ্যে আরো বলেছে যে, নবীর রওজার না গিয়ে স্থানীয় মসজিদে নামাজ পড়ে দোয়া করলে সওয়াব বেশী হবে। হাদীস শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, রওজা শরীফে প্রতি ঘন্টায় ৭০ হাজার করে দৈনন্দিন লক্ষ লক্ষ ফিরিশতা অবতরণ করতঃ জিয়ারত করে ধন্য হচ্ছেন, এই সত্য কথাটি খবিছ ইমাম মোটেই বিশ্বাস করেনি।

ইসলাম ধর্মের একটি বিধান রয়েছে যে, কোন নবী ওলী কোন স্থানে অবতরণ করলে অথবা কোন বস্তুকে স্পর্শ করলে সেই স্থান বা বস্তুটি চিরকালের জন্য বরকতময় হয়ে যায়। যেমন সাফা ও মারওয়া এ দুটি পাহাড়ের উপর ইসলাম পূর্ব হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) অস্থায়ী ভাবে বসেছিলেন, তাঁদের ক্ষণস্থায়ী বসাকে নবুয়তী নিদর্শন রূপে আল্লাহ পাক আখ্যায়িত করেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন: ان الصفا والمروة من شعائر الله সাফা মারওয়া আল্লাহ পাকের নিদর্শন। সেই নিদর্শনীয় স্থানে গমন করে হাজীগণের দৌড়া দৌড়ী করা ফরজ কাজ রূপে বিবেচিত হয়। আর যেস্থানের নিকটবর্ত্তি স্থানে সায়্যেদুল মুরসালীনের নূরানী দেহ এক বিশেষ সময় পর্যন্ত অবস্থান করছে তাই সে স্থানটি চিরকালের জন্য বরকতময় হবে না কেন ? সে স্থানে গমন করতঃ নামাজ দোয়া দরুদ পাঠ করলে হারাম হবে, এই মর্মে কোরআন হাদীস ইজমা কিয়াসে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রিয় নবী রাসুলে পাক (দঃ)-এর আদি দাদা হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) যে পাথর খানার উপর দাঁড়িয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন, সেই পাথর খানা সে স্থানে রেখে দেওয়া হয়। সেই স্থানটি চিরকালের জন্য স্বনাম ধন্য হয়। (مقام ابراهيم) আর সে স্থানটির বিশেষ গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্য তথায় নামাজ পড়া ওয়াজিব। স্বয়ং আল্লাহ পাক এই নির্দেশটি দেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى।

ইসলামের বাস্তব ইতিহাস সাক্ষ্য রয়েছে যে, রাসুলে আকরাম (দঃ)-কে হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) এর হুজরা মোবারকে দাফন করা হয়। হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন উক্ত হুজরাতে অবস্থান করে সেখানে নামাজ দোয়া পালন করতেন। যদি কবরের পার্শ্বে নামাজ কায়েম করা হারাম হত তবে তিনি কি করে সেখানে নামাজ পড়লেন। মনে রাখুন। কবরের পার্শ্বে নামাজ কায়েম করা হারাম নয় বরং সুন্নত।

হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) রওজা শরীফের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান কালে যে নামাজ কায়েম করেছেন তা আল্লাহ পাকের জন্য কায়েম করেছেন। কারণ নামাজের মূল মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। তবে হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) পূর্ণ অবগত ছিলেন, যে নামাজ আল্লাহ পাকের জন্য কায়েম হচ্ছে সেই নামাজ হুজুর (দঃ) মেরাজে গমনের পর তারই মাধ্যমে চালু হয়েছে। ইতি পূর্বে কেহ তো আল্লাহর জন্য নামাজ কায়েম করেনি। আর আল্লাহ পাক তো নিজে এসে আমাদেরকে নামাজ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেন নি। অর্থাৎ নামাজ আনয়ন কারীই নামাজের পূর্বাপর সব কিছুর প্রাপ্য অধিকারী। ইহা ছাড়া নামাজের মূল গঠণতন্ত্রের মধ্যে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) শামিল আছেন। যেমন আল্লাহ পাকের জন্য তাকবীরে তাহরীমা সহকারে নামাজ শুরু করা হয়। সেই নামাজের সমাপ্তি ঘোষণা দেওয়া হয় আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়্যু বাক্য দ্বারা নবী পাকের নামে। নামাজ ও ঈমানের শুরু হলেন আল্লা পাক এবং শেষ হলেন রাসুলে পাক (দঃ)। এই হিসেবে নামাজের মালিক হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল উভয়ই একসঙ্গে। যদি রওজার পার্শ্বে নামাজ পড়া হয় তবে বলা হবে যে, নামাজের মালিকের জন্য নামাজ কায়েম করা হল। কবর হল সকলের জন্য একটি চির অবস্থান কেন্দ্র। হুজুরে পাক (দঃ) জন্ম অবস্থান কেন্দ্রে স্বয়ং আল্লাহ পাকও সালাত পেশ করেছেন।

কবর বা প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর অবস্থান কেন্দ্রে নামাজ পড়ার প্রামাণ্য চিত্র হল পবিত্র কোরআন পাকের ان الله وملائكته يصلون على النبى এই আয়াত খানা। অর্থাৎ প্রিয় নবী হাবীবে খোদা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) পিতার নির্দিষ্ট বাসস্থানে মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ট হন তখন আল্লাহ পাকের পবিত্র জাত তার ফিরিশ্তাগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয় নবীর গৃহ দ্বারে উপস্থিত হন। প্রথমে আল্লাহ পাক অতঃপর ফিরিশ্তাগণ পরস্পর প্রিয় নবীর উপর সালাত পাঠ করেন। তবে আল্লাহর সালাত পাঠ পদ্ধতি কিরূপ ছিল তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। বিবি আমেনার গৃহ দ্বারে আল্লাহ পাক ও ফিরিশ্তাগণের শুভাগমনের মূল লক্ষ্য ছিল যে, ইহা অতি পবিত্র স্থান। প্রিয় নবীর ইন্তেকালের পর রাত দিন ফিরিশ্তাগণ নবী পাকের রওজা শরীফে উপস্থিত হয়ে পূর্ববৎ অভিবাদন পেশ প্রথা চালু রেখেছেন আজও। ফিরিশ্তা জাতের উক্ত অবতরণ নীতি আমাদের জন্য নবী পাকের রওজাতে সালাত সালাম পেশ করার প্রামাণ্য চিত্র হিসেবে বিবেচিত।

প্রত্যেক আশেকে রাসুল যখন প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হন তখন তাঁর রওজা শরীফকে সম্মুখে রেখে এক মনে এক ধ্যানে সালাত ও সালাম পেশ করেন। উল্লেখিত নিয়ম নীতির বিপরিত নীতি অবলম্বন করা রওজা পাকের সঙ্গে বেয়াদবী করার নামান্তর। আজকাল যারা রওজা পাকের পার্শ্বে নামাজ পড়তে দেয়না অথবা রওজা পাককে সম্মুখে করে দোয়া করতে দেয়না তারা নিঃসন্দেহে নবী পাকের ও ধর্মের চির শত্রু। নবুয়তের পরিপন্থী দল বিশেষ।

তৃতীয় পাঠ

কতিপয় ইসলামী নিদর্শন

دار الارقم দারুল আরকম

পাথর বেষ্টনি ও খোদাই করে লিখিত একখানা ঘরের নাম দারুল আরকম। প্রাচীন কালের আরবগণ এই ঘর খানাকে বৈদেশিক বনিক ও মুসাফিরদের অবস্থানের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত ঘর খানাকে ইসলামী নিদর্শণ রূপে আখ্যায়িত করার মূল কারণ এই যে, উহার মধ্যে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) ৪০ জন নও-মুসলমান সাহাবীকে সঙ্গে করে আত্মগোপন করেছিলেন। যতদিন তিনি এই স্থানে অবস্থান করেন ততদিন তিনি গোপনে গোপনে সঙ্গীগণকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তাই উক্ত ঘর খানাকে ইসলামী যুগের প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র বলা হয়। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) দারুল আরকমে আশ্রিত থাকা অবস্থায় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দোয়াটি করেন। আবার সেই ঘরে থাকতে থাকতেই তাঁর দোয়া আল্লাহ পাক বাস্তবে রূপায়িত করেন।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) যখন গোপন সূত্রে ইসলাম প্রচারের নিয়ম ধারা চালু করলেন তখন মক্কা বাসীরা উহা জানতে পেরে তাঁর উপর বিভিন্ন অত্যাচার শুরু করল! প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) অপারগ হয়ে দারুল আরকমে আত্ম গোপন করে রইলেন। সেখানে আত্ম গোপনে থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেন। হে আল্লাহ! আমি ইসলাম প্রচারে বাধা প্রাপ্ত হয়েছি! তুমি আবুজেহেল অথবা হযরত ওমরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে আমার হাতকে শক্ত কর।

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীর দোয়া সঙ্গে সঙ্গে কবুল করে নেন। অর্থাৎ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর অন্তরে আল্লাহ পাক ইসলাম কবুল করার উদ্বেগ সৃষ্টি করেন।

একদা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর মাথা দ্বিখন্ডিত করার উদ্দেশ্যে তরবারী হাতে নিয়ে ঘর হতে বের হন। পথিমধ্যে তাকে কেহ বলল, আপনি যাঁর মাথা কর্তন উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন, তাঁর মাথা কর্তনের পূর্বে আপনি নিজ ঘরের খবর নিন। ইহা শুনে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজ ভগ্নিপতি "সাদ" ও বোন ফাতেমার নিকট উপস্থিত হয়ে অনেক মার পিট করে শেষ পর্যন্ত বোনের মুখে কোরআন তেলাওয়াত শুনে তাঁর অন্তর গলে গেল। তিনি চিৎকার দিতে দিতে ভগ্নিপতিকে বললেন, আমাকে নবীর আস্তানায় উপস্থিত কর। ভগ্নিপতি তাঁকে সঙ্গে করে ধীরে ধীরে গোপনে গোপনে "দারুল আরকমে" নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখামাত্র ৪০ জন উপস্থিত সাহাবা ভয় ভীতি পরিহার করে তাকবীর ধবনী দিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) প্রিয় নবী হুজুরে পাকের নূরানী চেহারা মোবারকের দিকে তাকায়ে বললেন আস্‌সালাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে ইসলামী কালেমা পাঠ করান।

হযরত ওমর ফারুক ইসলামী কালেমা পাঠ করার পর প্রিয় নবীর দরবারে নিবেদন করেন যে, আমি আপনাকে দারুল আরকামে আর গোপন থাকতে দিবনা, আপনি আমার সঙ্গে চলুন প্রকাশ্য ধর্ম প্রচার করুন। হযরত ওমর ফারুক প্রিয় নবীকে সঙ্গে করে কা'বা ঘরের আঙ্গিনাতে অবাধে উপস্থিত হন। আর ঘোষণা দিয়ে বলেন, আজ হতে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) কা'বার আঙ্গিনায় প্রকাশ্যে ইবাদত উপাসনা করবেন। যদি কেহ তাঁকে ইবাদত উপাসনা করতে বাধা দেয় তাহলে আমি তার মাথা কর্তন করে রেখে দিব এখানে!

প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) হযরত ওমর ফারুকের আহ্বানের পর "দারুল আরকাম" ঘর খানা হতে ৪০ জন সাহাবীকে সঙ্গে করে বের হয়ে অবাধে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। প্রকাশ্য ইসলাম প্রচারের সূচনা লাভ হয় দারুল আরকম রেস্ট হাউজ হতে বের হওয়ার পর। তৎকাল হতে উক্ত ঘর খানা ইসলামী নিদর্শন রূপে আখ্যায়িত হয়! সাহাবাগণ উক্ত ঘর খানাকে আবেগ সহকারে অবলোকন করতেন এবং সেখানে গিয়ে নামাজ পড়ে দোয়া করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। এই স্থানটি দোয়া কবুলের স্থান।

ইসলামের পূর্ণ বিজয় সূচিত হওয়ার পর হতে তৎকালীন রাজা বাদশাহগণ দারুল আরকমের নির্মাণের প্রতি সুনজর রাখতেন। যুগযুগ ধরে সেখানে আল্লাহর বাণী এবং রাসূলে পাকের হাদীসের চর্চা হত! এই ঘরের নির্মাণ কার্যে কোন ক্ষতি সাধন হলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তখনই পুনঃ নির্মাণের ব্যবস্থা করতেন। দারুল আরকমের প্রায় পাথরের উপর সাহাবাগণ প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর উপদেশ বাণী খোদাই করে লেখে রেখেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করতে যে, বড় পাথর খানা প্রথমে নজরে পড়তো উহার উপর লেখা ছিল ঃ بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في الغدو والاصال ۔

ইহার গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আল্লাহ পাকের কোরআন পাকের নির্দেশ রয়েছে ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب আল্লাহ পাকের নিদর্শনাবলীর সম্মান বহন করা খোদা ভীতির প্রমাণ স্বরূপ।

নজদী ওহাবীগণ তুর্কী বাদশাহকে পরাজয় করানোর পর হতে আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাকের নিদর্শনাবলিকে প্রায় এক এক করে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে! আর তারা উহাকে স্বমূলে বিনষ্ট করার নাম রেখেছিল ইসলাম!

দারুল আরকমের পবিত্র ঘর খানা ইসলামী আদর্শের প্রথম নিদর্শন। যে ঘর খানার মধ্যে মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) প্রথম ইসলামী তালীম তর্বিয়াত প্রদান করেন। যেখানে ইসলামের প্রধান ও প্রথম প্রতীক হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। সে পবিত্র নিদর্শন খানাকে নজদীরা প্রথম ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। "দারুল আরকম" জান্নাতুল মোয়াল্লাহ কবর স্থান সংলগ্ন ছিল। আজ যদি কোন ধর্ম প্রাণ মুসলমান নিশ্চিহ্ন দার খানার অনুসন্ধান করে সেই স্থানে নামাজ পড়ে দোয়া পাঠ পর ইসলামী আবেগ এশক্ অনুভব করে তখন সেখানকার প্রহরীরা শুধু বলে কুল্লু হারাম, কুল্লু হারাম।

দারুল আরকমের প্রবেশ পথে উল্লেখিত আয়াতটি লেখার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পরবর্তী যুগে যারা এখানে উপস্থিত হবেন তারা যেন বিশ্বাস করেন যে, কোন যুগে এখানে ইসলামী তালীম তরবীয়ত চালু ছিল!

নবী-রাসূলের শুভাগমনের প্রত্যেক স্থানগুলো আল্লাহ পাকের নিদর্শন রূপে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন "গারে হেরা" এর মধ্যে প্রথম প্রথম মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) আল্লাহ পাকের এবাদত উপাসনার জন্য উপস্থিত হতেন। এই উপস্থিতির দরুন সেই স্থানটি নবীর নিদর্শন রূপে আখ্যায়িত হয়। আল্লাহ পাকের প্রথম ওহী সেই পবিত্র স্থানে অবতীর্ণ হয়।

হেরা গুহার মত আরো কতিপয় নবীর নিদর্শন রয়েছে যার মধ্যে নবী কখন একবার পদার্পন করেন সেই স্থানটুকুও ইসলামের পরিভাষায় ইসলামী নিদর্শন রূপে আখ্যায়িত। যেমন "ছুর" নামক গুহা, এই গুহাতে মহানবী (দঃ) হিজরত কালে মাত্র তিন দিন অবস্থান করেন! অনুরূপ যে স্থানে মহানবী সংগবদ্ধ ভাবে পদার্পণ করেন সেখান টুকু সর্বকালের জন্য ইসলামী নিদর্শন। যেমন শাজারে রেদওয়ানের ছায়াতলে হযরত নবী করীম (দঃ) ১৪শত অথবা ১৫শত সাহাবা কেরামগণ সহ সমবেত হন।

হযরত নবী করীম (দঃ) এর অবস্থান কেন্দ্র ওহী অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ছিল। আবার যেখানে ওহী নাজিল হত সেই স্থানটি চির কালের জন্য খোদার নিদর্শন রূপে পরিচিত হয়।

ইসলামী আদর্শের অপূর্ব নিদর্শন ঃ

জান্নাতুল মোয়াল্লা

জান্নাতুল মোয়াল্লা হলো মক্কা নগরীর একটি প্রাচীনতম কবর স্থান। যা কা'বা গৃহ থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। তথায় কবর ভূমির উপর দিয়ে ওহাবী সরকার একটি প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করে। যার ফলে কবরস্থানটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কোন জিয়ারত কারী যেন জিয়ারত না করতে পারে সেই জন্য উহার চতুর্দিকে দেওয়াল নির্মাণ করে ঘেরাও দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কবরের সকল প্রকার চিহ্নকে নিঃশ্চিহ্ন করা হয়েছে। চতুর্দিকে শুধু মাটির স্তুপ পড়ে আছে। জিয়ারতের কোন ব্যবস্থা নাই। কোন কোন কবরের উপর চিহ্ন স্বরূপ বেনামী পাথরের খন্ড ফেলে রাখা হয়েছে। তাও খুবই শোচনীয় ও জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। উহার যে অংশে হযরত আসমা, হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর, হযরত ইবনে ওমর, হযরত ইবনে জোবায়ের, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, হযরত ইমাম ইবনে জোবায়ের ও হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়েব (রাঃ) (অত্যাচারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক সকল শহীদদের) প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কবর সমূহ অবস্থিত। উহার ভিতরে যাতায়াত করার একটি পথ রয়েছে। কিন্তু উক্ত পথে কবরের নিকট গমন করা যায় না। উহা শুধু মাত্র নতুন মৃত লাশ দাফন করার যাতায়াতের জন্য নির্ধারিত নয়। আর উক্ত কবর স্থানের যে অংশে হযরত খাদিজা (রাঃ) এবং তাঁর অন্যান্য

বংশধরগণ সে স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর কলিজার টুকরা হযরত কাসেম (রাঃ) ও তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে দাফন করা হয়েছে, তথায় গমন করার কোন পথ রাখা হয় নি। এই স্বনাম ধন্য কবর সমূহ ভাংগা চুরা অবস্থায় মাটির স্তুপ আকারে পড়ে রয়েছে। বিশ্বের কোন কবর স্থানকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় ফেলে রাখা হয় নাই। উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) এর কবর দেখলে দেহ শিহরিয়া উঠে। মুসলমানগণ স্বীয় পত্নিদের কবরের উপর বিশ্ব বিখ্যাত "তাজমহল" নির্মাণ করে ফেলেছে। কিন্তু যে মহীয়সী নবী হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর সান্নিধ্য লাভ করার অপূর্ব সুযোগ পেয়েছেন, এবং যিনি হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) এর জননী হওয়ার পরম গৌরব লাভ করেছেন, তিনি একটি জরাজীর্ণ কবরে শুয়ে আছেন।

এ পরিবার বর্গের যে মহান সত্বার সদকার কারণে আরবরা সম্মানের অধিকারী হয়েছে। তাঁর পবিত্র নিদর্শনাবলী সমূহের এই শোচনীয় অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে উহা প্রকাশ্য ধর্ম অবমাননা। কা'বা শরীফের সন্নিকটে আবু কুবাইস পাহাড়ের উত্তরে মসজিদে বিলাল আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত। স্বয়ং আবু কুবাইস পাহাড় যার উপর দাঁড়ায়ে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করেন, সেই পাহাড়ের আজ কি অবস্থা যা না দেখলে অনুধাবন করা যাবেনা। সমস্ত ভূ-খন্ডের মালিক হলেন মহান আল্লাহ পাক, আর উহার মধ্যে গচ্ছিত সকল প্রকার ধনসম্পদেরও মালিক হলেন তিনিই। তাঁর সৃষ্টি জীবের ধন সম্পদে কোন ব্যক্তির এই রূপ অধিকার নাই যে, সে মানুষকে খাদ্যে পরিণত করে নিজে রক্ষক সেজে বসবে।

মীনার মধ্যবর্তী স্থানে মসজিদে আল খায়েফ অবস্থিত। উহা এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে বিদায় হজ্জের সময় মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) অবস্থান করেছিলেন এবং সাহাবীদের সাথে পাচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। প্রথম জামরু ও দ্বিতীয় জামরুর মধ্যবর্তী স্থানে অপর একটি ছোট্ট

মসজিদ অবস্থিত ছিল। উক্ত মসজিদকে মসজিদে আল-মাশরার বলা হয়ে থাকে। বিদায় হজ্জের সময় আঁ হযরত (দঃ) এর কোরবানীর উট এখানে জবাই করেছেন। এই মসজিদটি আজ ধ্বংস স্তুপে পরিণত। জামরা আকাবার সামান্য আগে ছোট একটি মসজিদ ছিল। উক্ত মসজিদকে মসজিদে আল-আশরাহ বলা হত। সেই স্থানটির নাম পর্যন্ত মুছে ফেলেছে বর্তমান আরবেরা। মদীনার কিছু লোক এখানে এসে মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর হাতে বায়াত হয়েছিল।

মসজিদে ইবনে আব্বাস ঃ

মসজিদে ইবনে আব্বাস ঃ এই মসজিদটিকে এমন এক স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিল ঠিক সে সময় তায়েফ অবরোধ কালীন সময় মুসলিম সৈন্য বাহিনী এখানেই অবস্থান করেছিল এবং উক্ত স্থানে যুদ্ধও সংঘঠিত হয়েছিল। উক্ত স্থানের সম্মুখে দক্ষিণ পশ্চিম কোনে তায়েফের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ কারী সাহাবীদের মাজার অবস্থিত। প্রথমে উক্ত কবর সমূহকে সীমা টেনে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন উক্ত সীমার প্রাচীরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে!

বর্তমান আরবগণ নবী, সাহাবা আওলীয়া সকলের কবরকে এক এক করে ধ্বংস করছে। এমন কি তাদের হাত থেকে আরবের মসজিদও রক্ষা পাচ্ছেনা!

ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর ঃ

ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরের নিদর্শনীয় বস্তু সমূহের অন্যতম নিদর্শন হল শহীদানে বদরগণের কবর। ঐ কবর সমূহ হিজাজের সাধারণ কবর সমূহের ন্যায় শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। কবরের উপর কোন চিহ্ন বা লেখা কিছুই নাই। শুধু মাটির স্তুপ পড়ে আছে সেখানে। কোরআন পাকের ৭৫টি আয়াতে বদরের শহীদানগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাঁরা এখানে শুয়ে আছেন অতি শোচনীয় অবস্থায়। তাঁরা সর্ব মোট ৩১৩ জন ছিলেন। তাদের মধ্য হতে বদর ময়দানে সমাহিত হয়েছেন মাত্র ১৪ জন। তাঁদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্ পাক ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেছেন। যার বিবরণ সমূহ পবিত্র কোরআন পাকে পুঞ্জিভূত করা হয়েছে। ইহা ছিল এইরূপ জিহাদ যে জিহাদের সময় আল্লাহ্ পাকের প্রিয় রাসুল মুসলমানদের সহায় সম্বল হীনতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, উহা আজ পূরণ করুন। অতঃপর তিনি সিজদায় পতিত হয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট স্বীয় আবেদন প্রার্থনা করেন।

হে খোদা! যদি এই মুষ্টিময় লোক আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার নাম স্মরণ করার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা।

আল্লাহ্ পাক রাসুলে পাকের প্রার্থনায় জবাবে ঘোষণা করেন ঃ কোরাইশদের আগত বাহিনীকে পরাজিত করা হবে, আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। বদর যুদ্ধে আরব প্রখ্যাত নেতা প্রধানগণ সামান্য সংখ্যক ইসলাম পন্থীদের হাতে নিহত হয়।

উক্ত বিজন প্রান্তরে অদ্যাবধি হযরত সাদ বিন ওবায়দা (রাঃ) এর আওয়াজের প্রতিধ্বনী যেমন আজও শুনা যাচ্ছে। আমি আল্লাহ্ পাকের

শপথ করে বলছি। হে নবী! আপনি যদি হুকুম করেন, তাহলে আমি মার মুখি হয়ে এখনই সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ব। আজও যেন বদর প্রান্তে হযরত মিকদাদ (রাঃ) এর সে আওয়াজের প্রতিধ্বনিত হচ্ছেঃ আমরা হযরত মুসা (আঃ) এর কাওমের ন্যায় নই, আমরা কখনো একথা বলবনা যে, হে নবী! আপনি ও আপনার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করুন। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে ও পিছনে থেকে (অর্থাৎ চতুর্দিকে আপনাকে) বেষ্টন করে যুদ্ধ করব।

তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন মাত্র ৩১৩ জন। তদুপরি তাদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিল মাত্র দু'জন। সেক্ষেত্রে কোরাইশ বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক হাজার। এর মধ্যে তাদের অশ্বারোহী চিল দুই শত। তাদের এই বিরাট শক্তিকে একেবারে হেস্ত নেস্ত করে দেয়া হয়েছে। কোরাইশ নেতাদের মধ্যে ২৪জন নিহত হয়েছিল। যথা আবু জেহেল, মায়াজ ও মোয়াবেবজ নামক দুই যুবক ভাইয়ের হাতে নিহত হয়েছিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তার মাথা কর্তন করে প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) এর পদতলে রেখেছিলেন। কোরাইশ বাহিনীর প্রথম প্রধান সেনাপতি উতবা হযরত হামজা (রাঃ) এর হাতে নিহত হয়েছিল। এই সমস্ত হলো উক্ত যুদ্ধের বিজয়ের খবর। আর এই সমস্ত শহীদগণ যাঁরা সেই দিন স্বয়ং হুজুরে পাক (দঃ) এর প্রাণ রক্ষা করে ছিলেন। তাঁদের কবর সমূহ আজ "সুন্নাতের উত্তরাধিকারীদের হাতে" পদদলিত হচ্ছে। ঐতিহাসিক মূল্যবান নিদর্শন সমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আবু জেহেল, ওতবা যাকে বিলুপ্ত করতে পারে নাই ঐসমস্ত নিদর্শণ সমূহকে আজ আমরা স্বয়ং নিজেদের হাতে ধ্বংস করছি। বদরের শহীদানগণ আল্লাহ পাকের দরবারে এত মাকবুল ছিলেন যাঁদের নামের দোহাই দিয়ে যে কোন দোয়া করলে আল্লাহ পাক তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন।

প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) হযরত জিব্রাঈল (আঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। প্রতি উত্তরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, ফিরিশতাদের মধ্যেও বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণও শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান। (সহীহ বোখারী)

জান্নাতুল বাকী ঃ

জান্নাতুল বাকী ইসলামী জগতের অন্যতম কবরস্থান ঃ যার দৈর্ঘ্য প্রায় আট একর পরিমান হবে। যার চতুর্দিকে প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু মাত্র একটি দরজা রয়েছে গেইট আকারে তার উপর একজন শসস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে সদা সর্বদা। কয়েক ব্যক্তি বাহিরে জিয়ারত কারীদের অপেক্ষায় আছে। তারা কোন বিনিময় ছাড়া আঙ্গুল দ্বারা কবর সমূহের নাম চিহ্ন ইচ্ছে মত দেখিয়ে থাকে। আর বলে এখানে দাড়াবেন না। চলে যান।

জান্নাতুল মোয়াল্লা কবরস্থানের ভাংচুরের যে করুন অবস্থা ছিল, এখানে আরো বেশী পরিমাণে ভাংচুর করা হয়েছে। কিন্তু জান্নাতুল বাকীতে প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) এর দুই তৃতীয়াংশ বংশধরদেরকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী দাফন করা হয়েছে। আরো রয়েছে এখানে অগনিত শহীদ, সাহাবী আকাবেরে দীন ও আইম্মা কেরাম। তারা আজ তথায় ভীষণ অপমানের স্বীকার হয়ে আছেন। উহা দেখা মাত্রই সাধারণের শরীরের রক্ত বিন্দু জমাট হয়ে উঠে। নিজেকে নিজে সংবরণ করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ঠিকই বলেছেন।

আরব বাসীরা হলো লাগামহীন উটের ন্যায়, তাদের রাশ আমার হাতে সমর্পন করা হয়েছে। আমি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ছাড়বই ইনশা আল্লাহ।

জান্নাতুল বাকীতে এখন কোন প্রকৃত আরব কবরস্থ হয় না। প্রকৃত আরববাসীগণ কবরে শুয়ে আছেন। মূলতঃ তারাই ছিলেন প্রকৃত আরববাসী কোরআন পাক তাঁদের জন্য নাজিল হয়েছিল। আজ আমাদের মত অনারবগণ তথায় গমণ করে থাকে। আর এমন এক দৃশ্যের সূচনা হয়ে থাকে যা দেখলে অন্তর কেপে উঠে। এখানে নবীর শহর মদীনা অবস্থিত। তাদের পাশেই জবলে নূর, জবলে রহমত। সাফা পাহাড়, ওহুদ পাহাড় অবস্থিত। তাদের রাস্তা সমূহ প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর পদধূলির কারণে উপকৃত হয়েছে। তাদের ভাষায় আল্লাহ পাক মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে সম্বোধন করেছেন। সর্ব শেষ নবীকে তাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাস তাদের কারণে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু তাদের নিদর্শণ সমূহের সংরক্ষণ করাকে তারা হাজা কুল্লু হারামুন বলছে।

তারা বিন্দু মাত্রও অনুধাবন করতে পারেন নাই যে, তাদের এ মাটিতে কে শুয়ে আছেন। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর কলিজার টুকরো গুলি শুয়ে আছেন। তাঁর জ্যোতিময় দৃষ্টি হলো এই সমস্ত জ্যোতিময় দৃষ্টির আলোক বর্তিকা। তাঁরা হলেন প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর চার চাচা, চাচাত ভাইগণ, মুসলিম উম্মাহর মাতা, জান্নাতের শাহজাদীগণ, আওলীয়া, ফুকাহা, ওলামা, ন্যায় পরায়নগণ, হযরত হালিমা সাদীয়ার ন্যায় সুভাগ্যবতি রমনী শুয়ে আছেন। কিন্তু আরব বাসীগণ উক্ত কবর সমূহ উৎপাটন করে তাদের নিজেদের জন্য গগনচুম্বী অট্টালিকা নির্মান করেছে।

উক্ত কবর স্থানে প্রবেশ করা মাত্রই ডান দিকের এক কোনে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর ফুফুগণ শুয়ে আছেন। আতেকা, সুফিয়া ও ফাতেমার কবর সমূহ অবস্থিত। সামনে অগ্রসর হলে দেখা যায় উম্মুল মুমিনিন নিদ্রামগ্ন আছেন, হযরত আয়েশা, হযরত সাওদা, হযরত জয়নব, হযরত হাফসা, হযরত উম্মুল মাসাকীন, হযরত উম্মে সালমা, হযরত উম্মে হাবিবা ও হযরত সুফিয়া (রাঃ) প্রমুখের মাজার অবস্থিত।

তাঁদের সাথে সারিবদ্ধ ভাবে শুয়ে আছেন হযরত আকীল (রাঃ) হযরত জাফর (রাঃ) হযরত তৈয়ব (রাঃ) হযরত ইমাম মালিক (রাঃ) হযরত ইমাম নাফে' (রাঃ) তাঁদের কবরের এক পাশে অনেক শহীদগণের মাজারের এক অংশ অবস্থিত। উহার সামনের দিকে প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) এর স্নেহের পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) এর মাজার অবস্থিত রয়েছে। উহার আশে পাশে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) হযরত রোকেয়া বিনতে ওসমান মাজউন (রাঃ) হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ (রাঃ) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত মালিক আনসারী (রাঃ) হযরত ইসমাইল বিন জাফর সাদেক (রাঃ) প্রমুখের মাজার অবস্থিত। উক্ত মাজারের একটু দূরে প্রাচীরের সাথে হযরত হালিমা সাদীয়ার মাজার অবস্থিত।

উম্মুল মুমিনীনদের মাজারের দশ বার গজ সামনের দিকে একখণ্ড পাথরের টুকরা পড়ে আছে। উহা বেশী হলে পাচ বা তিন গজ লম্বা হবে। এই স্থানটি ৬টি কবরের স্থান সংকুলান পরিমান হবে, উহার উপর কোন কবরের চিহ্নই নাই, উপর পাথরের টুকরা সমূহ পড়ে আছে। উহার ডান পাশে রাসূলে পাক (দঃ) এর কন্যা শুয়ে আছেন। সামনে হুজুরে পাক (দঃ) এর চাচা হযরত আববাস (রাঃ) এর মাজার অবস্থিত। হযরত আববাস (রাঃ) এর মাজারের ডান পার্শ্বে হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম জয়নাল আবদীন, হযরত ইমাম বাকের, হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) এর মাজার সমূহ অবস্থিত, উহার প্রতিটি কবরই মসজিদে নববীর পার্শ্বেই হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর কবর প্রতিষ্ঠিত।

প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন ঃ ফাতেমা আমার ইন্তেকালের ৬মাস পর আমার বংশধরদের মধ্যে সর্ব প্রথম পর জগতে আমার সাথে সাক্ষাত করবে, উহা বাস্তবও হয়েছে।

আর একটি হাদীসে আছে ঃ ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, যে ব্যক্তি তাকে দুঃখ দিবে, সে যেন আমাকেই দুঃখ দিল।

জান্নাতুল বাকী কবর স্থানের পূর্বরূপ

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, নজদী সরকার তুর্কী সরকারকে প্রতিহত করে ক্ষমতায় আসার পর তুর্কীদের শাসন আমলে জান্নাতুল বাকীতে অনেক কবর পাকা ছিল এবং উহার উপর খুব সুন্দর সুন্দর কোববা নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু নজদীগণ শরীফ হোসাইনকে পরাজিত করে মদীনা নগরী দখল করার পর জান্নাতুল বাকীর অধিকাংশ পাকা কবর ও কোববা সমূহকে এক এক করে ধবংস করে দিয়েছে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে মক্কা নগরীর আল মোয়াল্লা কবর স্থানের তুলনায় মদীনার জান্নাতুল বাকীর পাকা কবরের সংখ্যা অনেক বেশী হবে। উহার দিকে যাতায়াতের জন্য যে সড়ক নির্মান করা হয় তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে জান্নাতুল মোয়াল্লার কবর স্থানের সোজা উপর দিয়ে বড় সড়ক নির্মান করা হয় ইহা ধর্ম অবমাননাকর কার্য্য ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহাবা, আম্বিয়া ও আইম্মায়ে কেরামদের কবর সম্বন্ধে ইতি পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। নজদীগণের মতে কবরের নিকট গমন করা এবং কবরের উপর ফুলের মালা দেওয়া সরাসরি বেদআত।

কিন্তু তাদের পরিভাষায় বিধর্মীদের কবরের নিকট গমন করে তথায় ফুলের মালা দেয়া বেদআত নহে। আমীর ফাহাদ বিন সাউদ যখন আমেরিকা গমন করে বৃষ্টি বাদলকে উপেক্ষা করে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধি স্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর সেখানে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট র্জজ ওয়াশিংটনের সমাধিতে ফুল দিয়েছিলেন। নজদীগণের নিকট এই অপকর্ম বেদআত ছিল না।

ইসলামী নিদর্শনাবলীও কবর সমূহের সাথে নজদীদের অত্যাচারের বিবরণ আপনারা এ পর্যন্ত যা অবগত হয়েছেন, এখন প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান আপনারা বলুন তারা কিভাবে "আল মোয়াল্লা" "আল বাকীর' কবরস্থানদ্বয়কে ধ্বংস করে দিয়েছে ? সাহাবায়ে কেরাম ও হুজুরে পাক (দঃ) এর পূর্ববর্তী বংশধরদের স্মৃতি চিহ্ন সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তারা।. ইসলামের প্রাচীন নিদর্শনাবলীকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। যদি তারা এরূপ নিন্দনীয় কোন কাজ না করতো তাহলে উহা নজদীদের মতে তাওহীদের উপর আঘাত হানার শামিল হতো। আর উহাতে রিসালতের পয়গাম বিলুপ্ত হয়ে পড়ত। (আস্তাগফেরুল্লাহ)

আমাদের এতদ্দেশের নজদী অনুসারীগণ শাহ সউদের প্রশংসায় জুমার খোৎবাতে উচ্চারণ করছেন, আলসোলতান, জিল্লুল্লাহ। অর্থাৎ নজদীগণ নাকি আল্লাহর ছায়া। যারা বাদশাহকে অমান্য করবে আল্লাহ তাদেরকে ইহ জগতে অপদস্ত করবেন।

আমাদের এতদ্দেশের একদল গোলাপী নজদী আছে, যারা কবর জিয়ারত বন্ধকরে পূজার উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারতকে কবর পূজা আখ্যায়িত করছে। আরব নজদীগণ কবরের নিকট গমন করা বেদআত বলছে। আর বাঙ্গালী নজদীরা কবর ও মাজারের পার্শ্বে গমন করা শিরিক বলছেন। এই দ্বিতীয় দল অর্থাৎ যারা কবর জিয়ারতকে শিরিক বলছেন এবং তারাই আল্লাহকে শিরিক মুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ পাকের অত্যন্ত দরদী হয়ে গেছেন। প্রকৃত জিয়ারতকারীগণ আখেরাতের স্মরণ উদ্দেশ্যে যদি কবরের পার্শ্বে কোন অন্যায় কাজ করে বসে তা তার স্বইচ্ছায় নয়। আর যদি কেহ স্বইচ্ছায় কবরের পার্শ্বে কোন অন্যায় করে বসে, যেমন সিজদা করে বসল তখন অন্য জিয়ারতকারীর উপর ওয়াজিব সে যেন উক্ত কুকর্মকারীকে কুকর্ম হতে বাধা দেয়।

মৌলবাদী শক্তির কালো মুখ

ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন: হযরত ঈসা নবী (আঃ) এর যুগ হতে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর জন্ম আবির্ভাব পর্যন্ত অন্তত ৫শত বছর কোন নবী বা রাসুলের শুভাগমন ঘটেনি। সে যুগে মক্কাবাসীগণ নিজেদের চলার সুবিধার্থে স্বইচ্ছে বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে মৌলবাদ মতবাদটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ মৌলবাদকে তারা আরব ভূখন্ডে বিভিন্ন নামে প্রচার করে। যেমন: দ্বীন-ই এলাহী” “দ্বীন-ই তাওহীদ” “খোদাবাদ” ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধর্মের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে এক একজন ধর্ম প্রবর্তক মনোনীত ছিলেন। কিন্তু এই মৌলবাদের প্রবর্তকের জন্য কোন ব্যক্তি মনোনীত ছিলেন তার নাম আজও কেউ জানেন না। তারা এই মতবাদটিকে যতই আল্লাহ পাকের সহিত সম্পর্কিত করে থাকুক না কেন আসলে ইহা আল্লাহ পাকের মনোনীত কোন ধর্ম নহে। যদি আল্লাহ পাকের মনোনীত কোন মতবাদ থাকতো তাহলে ইসলাম ধর্মের দ্বারা এই তথাকথিত মতবাদটি রহিত হতো না।

মৌলবাদশক্তি আরব ভূখন্ডের বুকে বহুল প্রচারিত হওয়ার মূল কারণ ছিল এই যে, এ মতবাদটি যথাযথ ভাবে পালন করলে বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করা যেতো। আল্লাহ পাকের জন্য এবাদত বন্দেগীর মধ্যে অপকর্মে লিপ্ত হওয়াকেও তারা মৌলবাদ ভিত্তিক এবাদত বলে গণ্য করতো।

একবার দু'জন মৌলবাদী প্রেমিক প্রেমিকা কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তওয়াফ প্রদক্ষিনের মধ্যে অপকর্মে লিপ্ত হলে অন্যান্য প্রদক্ষিণ কারীরা এই কুকর্মকে হাতে তালি দিয়ে সমর্থন দেয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক উক্ত দু'জন ভ্যাবিচারীর ছবি বিকৃত করে পাথরে পরিণত করে দেন। এই দু'জনের একজনের নাম আসাফ (পুরুষ) দ্বিতীয় জনের নাম নায়েলা (মহিলা)।

তৎকালীন মদীনা প্রবাসী ইহুদীরা কাফের কর্তৃক মনগড়া মৌলবাদকে সমর্থন দেয়। যখন ইসলামী সংগ্রামের মাধ্যমে মৌলবাদী শক্তির মূল উৎখাত হতে লাগল তখন মক্কার কাফের ইহাকে বিকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়কে অনুরোধ জাপন করে। ইহুদীরা এই অনুরোধ বাস্তবায়নের জন্য প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে মৌলবাদের প্রবর্তক যদিও কাফের সম্প্রদায় ছিল কিন্তু মৌলবাদের বিস্তারক বা রক্ষক ছিল মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় একক।

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী শক্তি ঃ

বর্তমান যুগে ধর্ম পালনকারীর সংখ্যা অতি সামান্য এবং বিরল। প্রায় লোক হয়তো মৌলবাদী মতবাদে আছে অথবা ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদে আছে। মৌলবাদীরাতো ধর্ম প্রবর্তকের নাম লয় অন্ততঃ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ এই ব্যাপারে একেবারে নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতায় না আছে আল্লাহ পাক, না আছে নবী পাক। আর না আছে পীর বুজর্গ। তারা ধর্ম পালনে একে বারে সতন্ত্রবাদী।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে মৌলবাদী শক্তিরা খারেজী ফের্কার মতাদর্শী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেই দলে সুবিধা রয়েছে সেই দলে থাকে প্রায়। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীগণ বেহেশ্‌ত দোযখ উভয়টার আকাংখী। তাদের এক হাত দোযখের দিকে-অন্য হাত বেহেশ্‌তের দিকে রেখে দিয়েছে। এখন আল্লাহর ইচ্ছা-যেই দিকে নিবেন তিনি সেই দিকে শুরু শুরু করে চলে যাবে তারা। এরা হলো মধ্যম পন্থী। আল্লাহ পাক মানুষের জন্য দু'টি পথ নির্ধারণ করেছেন। প্রথম পথের পথিক হবেন মোমীন লোক। আর

দ্বিতীয় পথের পথিক হবে কাফের। এখন পথিকই নির্ধারণ করুক সে কোন পথের পথিক। এই দু' পথ ছাড়া আল্লাহ পাক কোন পথের দিকদর্শন করেন নাই।

মৌলবাদী শক্তির সূচনা কাল

পঞ্চম হিজরী সনে মদীনাবাসী ইহুদী (মৌলবাদী শক্তির) আহবানে মক্কানিবাসী কাফের সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণ করে। আক্রমনে পরাজয় বরন করে মক্কার কাফেরগণ মক্কায় চলে যায়, মদীনা নিবাসী ইহুদী সম্প্রদায় মদীনায় থেকে যায়।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) মদীনা প্রবাসী ইহুদীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা আমার প্রতিবেশী হয়ে যখন এই কুকর্মে লিপ্ত হলে তখন তোমরা হত্যার উপযোগী হয়ে গেছ। তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা না করে মদীনার নিকটস্থ “খায়বার’ এর কৃষি ভূমিতে বহিস্কার করলাম।

ইহুদী সম্প্রদায় মদীনা হতে বহিস্কার হয়ে খায়বরের মধ্যে দু'বছর পর্যন্ত থেকে মদীনা আক্রমনের জন্য আত্মরক্ষা মূলক সেখানে কয়টি শক্ত শক্ত কিল্লা নির্মাণ করে। ৭ম হিজরী সনে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক কিল্লা সমূহকে স্বমূলে ধ্বংশ করানো হয়।

ইহুদী সম্প্রদায় বারংবার বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পর হযরত নবী করীম (দঃ) তাদেরকে সমগ্র আরব হতে বহিস্কার করে বিভিন্ন দেশে বিতাড়িত করেন। তারা বহিস্কার হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আরব বহিরগত দেশের দিকে পাড়ি দেয়। তবে তাদের এক ক্ষুদ্র দল আরবের ইয়েমেন প্রদেশে লুকিয়ে থাকে। এমনকি তারা হযরত ওসমান (রাঃ) এর খেলাফত আমলের প্রায় শেষ পর্যন্ত গুপ্তচর রূপে পালিয়ে

থাকে। ইয়েমেনের শাসনকর্তার হাতে ধরা পড়ার পর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমাদের পরিচিতি পেশ কর। তখন তারা মদীনার মুসলমান হিসেবে পরিচিতি দিয়ার লক্ষ্যে মদীনা গমনের নামে শাম দেশে গিয়ে পৌছে। তখন শাম দেশের শাসনকর্তা ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তিনি আগত ইহুদী মৌলবাদী গুপ্তচরদের ঈমান আকীদা পরিক্ষা না করে তাদেরকে পৃথক পৃথক সৈন্য বাহিনী পদে নিযুক্ত করেন। গুপ্তচর ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতারক আবদুল্লাহ বিন সাবার বিশেষ উপযুক্ততা দেখে হযরত মুয়াবিয়া তাকে সেনা প্রধান পদে নিযুক্ত করেন।

যে বছর এই ইহুদী প্রতারক মুয়াবিয়ার সেনা প্রধান হয় ঠিক সেই বছর হযরত ওসমান (রাঃ) কে বিদ্রোহীরা শহীদ করে এবং তাঁরই স্থানে হযরত আলী (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কে তাঁর সেনা প্রধান উসকানী দিতে থাকে যে, আপনি হযরত ওসমানের খুনের বিচারের দাবীদার হউন। হযরত আলী রাঃ) যদি সত্বর বিচার না করেন তাহলে আপনি হযরত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন। যুদ্ধ আমি নিজে পরিচালনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হযরত আলীরে মুয়াবিয়ার প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন সাবা প্রখ্যাত মৌলবাদ শক্তি স্বয়ং মুয়াবিয়ার নিকট মায়া কান্না করে বললঃ আপনার পিতা আবু সুফিয়ান আরব বিখ্যাত নেতাকে ৮ম হিজরী সনে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ জোর জবর দস্তি ইসলামে দীক্ষিত করান, আর আপনিও সেই দিন বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইতি পূর্বে হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে আমাদের ইহুদী সম্প্রদায়কে প্রথমে মদীনা হতে তার পর খায়বর হতে চির কালের জন্য বিদায় নিতে হয়। আজও আমরা স্বাধীন ভাবে আরবে বসবাস করাতো দূরের কথা বরং আরবে অনুপ্রবেশের অধিকার পাচ্ছিনা।

প্রতারক সাবা মুয়াবিয়াকে আরো বুঝালেন যে, হযরত ওসমান গণি (রাঃ) আপনার বংশের লোক তাঁর হত্যার বিচারে বিলম্ব করা বানু উমাইয়া

বংশের সম্মান হানীর নামান্তর। এই সব নানা প্রতারনা করতঃ আবদুল্লাহ বিন সাবা ইহুদী হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কে হযরত আলী (রাঃ) এর উপর খেপায়ে তুলল। প্রতারক ইহুদীর মুসলমানীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর বিপক্ষে হযরত ওসমান (রাঃ) কেসাস এর দাবীদার হয়ে গেলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, হযরত মুয়াবিয়া সাবা শয়তানের চক্করে আবদ্ধ হচ্ছে তাই তিনি মুয়াবিয়াকে শাম দেশের শাসন কর্তার পদ হতে বরখাস্ত করে সেই পদে অন্য লোক নিয়োগ করলেন। এতে মুয়াবিয়া আরো ক্ষিপ্ত হয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে ফোরাত নদীর তীরে সিফফিন নামক স্থানে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং সর্বপ্রথম পদক্ষেপে ফোরাত নদীর তীর দখল করে নিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বুঝলেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) কেসাসের ঘটনা অজুহাত করে মুয়াবিয়া স্বয়ং প্রতারক ইহুদীর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। অপারগ তিনি ২০ হাজারের সৈন্যের একটি বাহিনী সিফফিনের ময়দানে পাঠান। এই বাহিনী সে স্থানে পৌঁছে দেখেন যে, ফোরাত নদীর তীর মুয়াবিয়া বাহিনীর পূর্ণ দখলে রয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) এর সেনা প্রধান মুয়াবিয়ার সেনা প্রধান (সাবা ইহুদী) এর সঙ্গে যোগাযোগ বহাল করে জিজ্ঞাস করলো যে, হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আলী (রাঃ) এর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির প্রতিদ্বন্দিতা চলছে যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুই মুসলিম প্রতিপক্ষ দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে সৈন্য সমাবেশ করছেন এই ক্ষেত্রে তোমরা যে, হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীর পানি রুখে রেখেছ এটাতো একেবারে হারাম। মুয়াবিয়ার ইহুদী বাহিনী প্রতি উত্তরে বলল, আমার সকল বাহিনী ইহুদী সম্প্রদায় এবং আমরা হালাল হারাম মানিনা। আর হযরত মুয়াবিয়াকেও আমাদের মত অনুসারী করে ফেলেছি।

এই জবাব পাওয়ার পর হযরত আলী (রাঃ) এর মুসলিম বাহিনী বুঝে নিলেন যে, আমিরে মুয়াবিয়া এবং তার সৈন্য বাহিনী সকলই কাফের এবং ইহুদী মতবাদ সমর্থক। অতঃপর ইহুদী বাহিনী এবং মুসলিম বাহিনী পরস্পর যুদ্ধে মেতে উঠলো। মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে যখন ইহুদী বাহিনী পরাজয় বরন নিশ্চিত হল তখন তারা আল্লারে-খোদারে শত চিৎকার দিল কিন্তু আল্লাহ তাদের দিকে মুখ তোলে দেখলেন না একবার।

দিশা হারা হয়ে ইহুদী বাহিনী এবার কোরআনকে তীরের মাথায় গেঁথে গেথে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল যে, হে মুসলিম বাহিনী। তোমরা এমতবস্থায় কি করে যুদ্ধে রত রয়েছ। তোমরা কি আল্লাহ পাকের গজবকে ভয় করনা।

হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীর প্রায় লোকই মৌলবাদ সমর্থক ছিল তন্মধ্যে ৭০ জন লোক অল্প বিদ্যা অতি ভয়ংকর ছিল-যারা মন্ত্রের মত কোরআন পাঠ করতে পারত তবে কোরআন পাকের মর্মার্থ বুঝতে পারতোনা, তাঁদের মোহতামীম (পরিচালক) সাহেবের নাম ছিল ''মাসয়ার বিন তামীম' এবং আওয়াল সাহেবের নাম ছিল যায়েদ বিন হোসাইন এই ৭০ জন হাফেজে কোরআন, ইহুদী সাবার কোরআনের দোহাইতে বড় অনুতপ্ত হয়ে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আলী (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, পরাজয় বরন করলে নাকি? হাফেজে কোরআনগণ বললেন না না হুজুর। আমরা যুদ্ধে অগ্রগামী রয়েছি তবে এক বিরাট অসুবিধা হয়ে গেছে যে, সাবারদল কোরআনকে তীরের মাথায় গেথে আমাদের দুনয়নের সামনে নাড়া চাড়া দিচ্ছে। এমতবস্থায় আমাদের পক্ষে যুদ্ধ চালানি অসম্ভব হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, কোরআনকে তীরের মাথায় উত্তোলন মুয়াবিয়া বাহিনী করেছে তাই তারা এই অপকর্মের জন্য দায়ী হবে।

ইহা ছাড়া ইহুদীগণ যে কোরআনকে কোরআন বলে অজুহাত করেছে হয়তো উহা তাদের সেনা রেজেষ্টার পুস্তক হবে। এখন যাও তোমরা যুদ্ধে রত হও। হাফেজে কোরআনগণ যুদ্ধে রত হওয়ার জন্য রণক্ষেত্রে দিকে ছুটে পড়লেন কিন্তু যুদ্ধের কষ্টের ভয়ে তারা সেখানে গিয়ে ঘোষণা দিল বিপরিত। অর্থাৎ হাফেজে কোরআনগণ এক বাক্যে বলে উঠলো ঃ হযরত আলী (রাঃ) যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘোষণা শুনে সকল সৈনাদল যুদ্ধ বন্ধ করে ময়দানে দাঁড়িয়ে রইল। এর ফুরসুতে আবদুল্লা বিন সাবা ইহুদী চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো যে, তোমরা আমার দলে এসে পড়, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) উভয় কাফের হয়ে গেছে। হযরত আলী (রাঃ) সৈন্য বাহিনী মোহতামীম ও আওয়াল সাহেবের মুখের দিকে যখন চেয়ে রইল তখন তাঁরা দু'জন মৌলবাদী আল্লাহ পন্থী নির্দেশ দিলেন যে, আলী ও মুয়াবিয়া উভয় যখন কাফের হয়েছে তখন তাঁদের সেনা নিবাসে ফিরে যাওয়া যায়না। এখন সকল উভয়ের সৈন্যদল আবদুল্লাহ সাবার সঙ্গে হারুরাতে চলে গেল। মোহতামীম সাহেব ও আওয়াল সাহেব কোরআন হেফজের মর্যাদা রক্ষা করে তাঁরা দুজন সৈন্য দলের লাইনের প্রথমে আল্লাহু, আল্লাহুর যিকির মুখে করে চলতে লাগল এবং সকল মৌলবাদী সৈন্য দু'জনার পিছে পিছে মার্চ করতে করতে হারুরার মৌলবাদ বনাম দারুত্ তাওহীদে পৌঁছে উচ্চস্বরে আযান দিলো। আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার। এই ঘটনাটি সংগঠিত হয় বর্তমান কুয়েতের হারান নামক অঞ্চলে।

দমে দমে আল্লাহু - এবারের সংগ্রাম মৌলবাদী সংগ্রাম ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ঃ

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার সেনা বাহিনীর প্রধানের নাম ছিল মৌলবাদী আবদুল্লাহ বিন সাবা এক একজন প্রখ্যাত ইহুদী। সে সিফফিনের যুদ্ধের অবসানের পর হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর যোদ্ধাগণকে বিশেষ প্রতারনার মাধ্যমে হারুরাতে নিয়ে ইহুদী বানায়ে ফেলে।

হযরত আলী (রাঃ) এর সেনাবাহিনীতে ৭০ জন হাফেজে কোরআন ছিল। তারা ইহুদী সাবার খপ্পরে পড়ে প্রথমেই ঈমান হারালো। হাফেজে কোরআনদের মধ্যে তিন জন অত্যন্ত জালালী সুরে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে এই ঃ ১। মাসয়ার বিন তামীম। ২। যায়েদ বিন হাসিন ও ৩। ফারদা বিন নওফিল।

হাফেজে কোরআন "মাসয়ার" কে ঠাকুর পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সাবা ইহুদীর নির্দেশ মোতাবেক হারুরার সংসদ ভবনে তালীম তরবিয়াতের জন্য "জামেয়া ফোরকানীয়া" নামে একটি হেফজ খানা কায়েম করে। তালীম তরবীয়তের নামে প্রথমে দমে দমে আল্লাহু, আল্লাহুর যিকির চালু করান। লেবাসে পোষাকে তারা ছিলেন একেবারে ফিরিশতা। হারুরাবাসীর হাস মুরগী, ভেড়া-ছাগল যত কিছু চুরি ডাকাতি ছিনতাই করে আস্তানাতে আনা হত এবং উহা আল্লাহ পন্থীগণ বিসমিল্লাহ পাঠ করে হালাল করে নিতেন। ইহুদী পন্থী হাফেজে কোরআনগণ নিজ শিক্ষা হতে অনেক নতুন বিধান চালু করে একটি চমক সৃষ্টি করে ফেলে ছিলেন বটে।

হাফেজে কোরআনগণদের বড় খেদমত ছিল যে, তাঁরা হারুরাতে আযান দিয়ে নামাজ কায়েম করতেন। করুন সুরে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। আল্লাহু, আল্লাহু, যিকির দ্বারা হারুরার ভূমিকে মুখরিত করে তুলতেন। তখন যিকির আজকার ছাড়া প্রসিদ্ধি লাভের আর কোন উপায়ও ছিলনা। কারণ তারা তেলাওয়াত যিকির ছাড়া অন্য কিছু জানতেন না।

যায়েদ বিন হাসিন সাহেব মোহতামীম মাসয়াব সাহেবের ছাত্র ছিলেন। তাঁর দ্বারা আযান একামতের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ সমাধা হত না। তবে ফায়দা বিন নওফিল সাহেব তিনি সামরিক বিভাগে ভাল উন্নতি করে ফেলে ছিলেন। সে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার একটি বিরাট বাহিনীকে সামরিক কাবেলিয়ত দ্বারা নতিস্বীকার করায়ে ফেলে ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন সাবার পর এই দ্বিতীয় ব্যক্তি মৌলবাদ বিস্তারের দায়িত্বভার নিজেই গ্রহন করেন। মাসয়ার এবং যায়েদ এই দু'জন হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে হারুরা আক্রমনে নিহত হয়।

মৌলবাদী হাফেজে কোরআনগণ যে মতলবে আল্লাহকে যেই ভাবে অনুশীলন করেন সেই ভাবে পেয়ে ছিলেন। হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দিদারের রিচার্স করে আল্লাহ পাককে তুর পাহাড়ের উপর পেয়ে ছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ পাকের দিদার লাভের জন্য মিরাজের রির্চাস করেছিলেন তাই আকাশ জগতে আল্লাহ পাকের দিদার লাভ করেন তিনি।

নমরুদ মালাউন তীর শিকার দ্বারা আল্লাহর রির্চাস করে, আল্লাহ পাক তীরের মাথায় রক্ত লাগায়ে নিজের পরিচিতি বহন করেন। ভারত উপমহাদেশে ওহাবী খারেজী মাযহাব পত্তনকারী জনাব ইসম্যাইল দেহলভী সাহেব আল্লাহ পাকের হাতের রির্চাস করেছিলেন, আল্লাহ পাক তার সেই মতলবী রির্চাসকেও পুরা করেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ পাকের হাতকে টেনে সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীর হাতে রেখে দিয়ে বললেন এখন হতে আপনি আল্লাহ পাকের মুরীদ। যার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ পাকের সাথে হয়ে গেছে তার জন্য নবীর সাথে সম্পর্ক করার আদৌ প্রয়োজন নেই।

খারেজী পন্থী ইসমাইল সাহেব, সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভী (রহঃ) কে সঙ্গে করে বালা কোটে শিখ জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য যখন পাঠান রাজ্যে পৌঁছে গেলেন তখন তিনি বিবাহ করার রির্চাস করেন। আল্লাহ পাক তাও পূর্ণ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তার বিবাহ এর জন্য ইউসুফ জর্গাজয়ী পাঠানের দু' মেয়েকে এক সঙ্গে বিবাহ করা নসিব করান।

শয়তান মরদুদ রির্চাস করলো যে, কোন পদ্ধতিতে হযরত আদম (আঃ) কে প্রতারিত করা যায়। আল্লাহ পাক তার সে মতলবও পুরা করেন। আল্লাহ পাক নেককার ও বদকার সকলেরই আল্লাহ। সকলেরই মতলব পুরা করেন। তবে দেখতে হবে সেই মতলবটা কোন ধরনের। যদি মতলব ভাল ধরনের হয় তবে উহার প্রতিফল ভাল হবে, আর মতলব খারাপ হলে তার প্রতিফল জাহান্নাম।

একজন মৌলবাদ ওয়ায়েজের চমৎকার ঘটনা ঃ

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাঃ) এর মসজিদে কুফার যাতায়াত পথে একজন মানুষ বিষম কাঁদতে ছিল। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার উপর কে অত্যাচার করেছে, আমাকে বল। আমি তাকে কঠুর শাস্তি দিব। কিন্তু ক্রন্দনকারী কাঁদার চাপে পড়ে কোন উত্তর দিতে সক্ষম হলনা। হযরত আলী (রাঃ) তাকে বুকে জড়ায়ে মসজিদে কুফার মধ্যে নিয়ে গেলেন। নামাজ শেষে উপস্থিত মুসল্লিগণকে জিজ্ঞেস

করলেন, এই দুর্বল ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তি অপদস্ত করেছে-দাঁড়াও। কেহ দাঁড়াল না। তবে উপস্থিত জনতার মধ্যে একব্যক্তি দাড়ায়ে বলল, হুজুর! ক্রন্দনকারীকে কেহ আঘাত করেনি সে নিজের আঘাতে নিজেই কাঁদছে। এই কথা শুনে প্রত্যেক মুসল্লী ক্রন্দনকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

অগত্যা ক্রন্দনকারী দাড়ায়ে বলল, আমাকে কেহ আঘাত করেনি বরং আমি মহামান্য একজন ওয়াজের নসিহতের মর্ম অর্থ অনুধাবন করে কাঁদছি। ওয়াজ সাহেব যেরূপ অন্তর কাঁপানীর ওয়াজ ফরমান এরূপ ওয়াজ আমি কারো মুখে আজ পর্যন্ত শুনি নেই।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন ওয়াজ শুধু তুমি একা শুন নি বরং অন্যরাও শুনেছে, তাহলে তুমি একা কেন কাঁদছ ?

ক্রন্দনকারী তখন ওয়াজের রহস্যটা খুলে বলল। ১। ওয়ায়েজ সাহেব শুধু আল্লাহ পাকের রশি শক্ত ভাবে ধরার কথা বলছেন। সেই ক্ষেত্রে আমি ধর্মের রশি ধরে বসে আছি। ওয়ায়েজ সাহেব আরো বলেছেন আল্লাহ পাকের রশি হাত ছাড়া হলে দোযখগামী হতে হবে। দোযখে প্রবেশ করলে সেখানে সাপ বিচ্ছু চরম ভাবে দংশন করবে। হুজুর! আমি দোযখের ভয়ে কাঁদছি। আপনি কাওকে শাস্তি দিবেন না! হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইহা ছাড়া তুমি তার অন্য কোন ওয়াজ শুনেছ ? ক্রন্দনকারী বলল হ্যাঁ।

২। মহামান্য ওয়ায়েজীন সাহেব আরো বলেছেন, ধর্ম পালন ক্ষেত্রে সকল মানুষ সতন্ত্র। অর্থাৎ কাফের কুফরী ধর্ম পালন করতে পারবে। আর মুসলমানগণ ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারে। ধর্ম পালন ক্ষেত্রে এক ধর্ম অবলম্বী অন্যের উপর কোন বাড়াবাড়ী করবেন না। সব সময় ধর্ম নিরপেক্ষ থাকবেন এটা আল্লাহর অকাট্য ঘোষণা।

হযরত আলী (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, কুফার মসজিদে মৌলবাদী শয়তান প্রবেশ করেছে! অতঃপর সেই মৌলবাদ পন্থী শয়তান ওয়ায়েজকে

সম্মুখে ডেকে বললেন, আল্লাহ পাকের রশির ধরে রাখার অর্থ কি ? কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের বিধান রহিত হওয়ার আইন কি ?

ওয়ায়েজ সাহেব যখন কোন উত্তর দিতে পারলেন না তখন তাকে বেত্রাঘাত করে মসজিদ হতে বিতাড়িত করেন। এই মৌলবাদীর হাতে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন।

নোট ঃ হিন্দুস্থানী ওহাবী আলেমরাও মৌলবাদ পন্থী ছিল। কারণ দেওবন্দ মাদ্রাসার বড় মুরব্বী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব সন্ত্রাসী খারেজী ফের্কাকে কাফের বলতেন না। তিনি বলতেন যারা খারেজী ফের্কাকে কাফের বলবে তারা কাফের হবে। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া ৪০ পৃঃ)

○ রাফেজী ও খারেজীকে কাফের বলার মধ্যে মতভেদ আছে। ৬২ পৃঃ
○ সাহাবা কেরামকে কাফের বললে কোন ক্ষতি নাই। ১৩১ পৃঃ
○ হানাফী শাফেয়ী ইত্যাদি মাযহাব ঘৃণিত-সবিলুর রোশাদ। ২১ „
○ সাহাবা কেরামদের সঙ্গে বে-আদবী করা সাধারণ গোনাহ। তবে দেওবন্দীগণের সঙ্গে বেআদবী করলে কাফের হবে। ১৬ পৃঃ রশিঃ
○ সাহাবা কেরামগণকে কাফের বললে সুন্নিয়ত বাতিল হয় না। রশিদিয়া ৪২ পৃষ্ঠা।

হযরত আদম ও ইবলিশ শয়তানের মধ্যে লুকোচুরি

হযরত আদম (আঃ) ও ইবলিশ শয়তানের মধ্যে খান্নাসের লালন পালনকে কেন্দ্র করে যেই লুকোচুরি সংগঠিত হয়, হাকীমে তিরমীজী তা হুবাহু "নাওয়াদিরুল উসুল" নামক গ্রন্থে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেন। আল্লামা ইমাম কুরতবী (রহঃ) উক্ত ঘটনাটিকে হযরত ওহাব বিন মোনাব্বাহ (রাঃ) হতে সনদ সহকারে জামেউল আহকাম গ্রন্থে স্ববিস্তারে বর্ণনা করেন।

লুকোচুরি ঃ ইবলিশ শয়তানের প্রতারনার শিকার হয়ে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ) দু'জন শান্তির স্থান বেহেশ্‌ত হতে বিতাড়িত হন। অতঃপর তাঁরা দু'জন শান্তি ভোগ করার জন্য শ্রীলংকায় ঘর বাড়ী বেধে কৃষিকার্যে নিমগ্ন হন। কারণ তাঁদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎসহ ছিল কৃষি কার্য সম্প্রদান।

একদা হযরত আদম (আঃ) বিবি হাওয়া (আঃ) কে গৃহে রেখে স্বয়ং কৃষি কাজে চলে যান। এই সুযোগে ইবলিশ শয়তান খান্নাস নামের নিজ শিশু সন্তানকে এনে বিবি হাওয়া (আঃ) এর লালন পালনে দেয়। বিবি হাওয়া (আঃ) এর তখনো কোন সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহন করে ছিলেন না। তাই তিনি আদর যত্নে খান্নাস শিশুটিকে দুধ ভাত খাওয়ায়ে পালন পোষণ করতে থাকেন।

হযরত আদম (আঃ) বাড়ী ফিরে দেখলেন যে, বিবি সাহেবা একটি অপরিচিত সন্তানকে যত্ন করছেন, তিনি অবাগ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এই শিশু পেলে কোথায়? বিবি সাহেবা জবাব দিলেন যে, এক অপরিচিত মানুষ আমাকে এই শিশুটি দিয়ে গেছে। আমি নিষ্পাপ শিশুর লালন পালন করছি এতে আপনার অসম্মতির কোন কারন থাকতে পারেনা।

হযরত আদম (আঃ) বললেন, বিবি! শিশুতো পালছনা বরং কাল সাপ পালছ। কারণ এই শিশুতো ইবলিশ শয়তানের যার কুপ্ররোচনায় পড়ে আমরা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আজ দূরদেশে নির্জন স্থানে শাস্তিভোগ করছি। আর এদিকে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে শয়তানের শিশু ছেলে খান্নাসকে লালন পালন করছ।

বিবি হাওয়া (আঃ) বললেন ইবলিশ শয়তানতো নিঃসন্দেহে পাপিষ্ঠ তবে তার ছেলেতো একেবারে বেগুনাহ। স্বামী স্ত্রী মধ্যে অনেক কথা কাটা কাটির পর হযরত আদম (আঃ) ক্ষিপ্ত হয়ে বিবিকে বললেন শিশুটিকে আমার সম্মুখে হাজির কর আমি তাকে টুকরো টুকরো করে নিশ্চিহ্ন করে দিব। বিবি হাওয়া বললেন আপনি কি করতে যাচ্ছেন জানিনা তবে আমাকে এই অপরাধে জড়াবেন না কিন্তু।

০ হযরত আদম (আঃ) এর সামনে খান্নাস শিশুকে উপস্থিত করার পর তিনি দাও দিয়ে চার খন্ড করে বাড়ীর চারটি গাছের সঙ্গে লটকায়ে রাখলেন। অতঃপর তিনি খাওয়া দাওয়া করে কৃষিকাজের প্রতি মুখি হন। ইবলিস শয়তান এসব কর্ম কান্ড দূর থেকে প্রত্যক্ষ করছিল। হযরত আদম (আঃ) এর বাড়ী হতে বের হওয়ার পর পরই শয়তান বিবি হাওয়ার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল আমার ছেলে কোথায়? প্রতি উত্তরে বিবি হাওয়া বললেন আমার স্বামী নিরপরাদ শিশু সন্তানটিকে খন্ড খন্ড করে গাছের সাথে লটকিয়ে রেখেছেন। এই চরম মুহূর্তে আমার কিছু করারও ছিলনা। ইবলিশ শয়তান বিবি হাওয়া (আঃ) এর বক্তব্য শুনে গাছের নিচে দাড়িয়ে হে খান্নাস! হে খান্নাস! বাক্য উচ্চারণ করে চিৎকার দিতে লাগলো। খান্নাস পিতার ডাক শুনে জবাব দিল বাবা আমি গাছের সঙ্গে লটকিয়ে রইছি। শয়তান বলল স্বশরীরে নেমে এসো! খান্নাস পূর্ববত স্বশরীরে নেমে পিতার সমীপে উপস্থিত হল। অতঃপর ইবলিশ

শয়তান পুনঃবার খান্নাসকে বিবি হাওয়ার লালন পালনে দিল। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় খান্নাসকে দুধভাত খাওয়ায়ে লালন পালন শুরু করলেন।

○ কর্ম বিরতি পর হযরত আদম (আঃ) গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি যেই শিশুকে খন্ড খন্ড করে গাছে লটকিয়ে রেখে ছিলেন সে পুনঃরায় জীবিত হয়ে বিবি হাওয়ার লালন পালনে রয়েছে। এবার স্বহস্তে খান্নাসকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে হাড় মাংশ খন্ড খন্ড করে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমুদ্রের তীরে নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেন। হযরত আদম (আঃ) ধারনা করেছিলেন যে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে ইবলিশ শয়তান তার শিশু সন্তান খান্নাসের সন্ধান একেবারেই পাবে না, কিন্তু ঘটনার ফলাফল বিপরিত হল।

○ হযরত আদম (আঃ) খান্নাসের ছাই সমুদ্রের বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে গৃহে ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর পূর্বের ন্যায় কৃষি কাজে রওয়ানা দিলেন। তিনি কিছু দূরে যাওয়ার পর ইবলিশ শয়তান পূর্বের ন্যায় বিবি হাওয়ার দ্বারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো আমার ছেলে কোথায়? প্রতি উত্তরে বিবি হাওয়া বললেন হযরত আদম (আঃ) তো এবার খান্নাসকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ইবলিশ শয়তান সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে জোরে জোরে চিৎকার দিতে লাগলো, হে খান্নাস! হে খান্নাস! সমুদ্রের গর্ভ হতে খান্নাস উত্তর দিল বাবা আমি সমুদ্রের গর্ভে রয়েছি। ইবলিশ শয়তান বলল পূর্বের ন্যায় স্বশরীরে আমার সম্মুখে উপস্থিত হও। খান্নাস স্বশরীরে উপস্থিত হওয়ার পর তাকে পুনঃবারও বিবি হাওয়ার লালন পালনে দিল। তিনিও আবার খান্নাসের লালন পালন শুরু করলেন।

○ হযরত আদম (আঃ) বাড়ী ফিরে দেখলেন যে, বিবি সাহেবা খান্নাসকে দুধভাত খাওয়াচ্ছেন। তিনি ও বিবি হাওয়া দুজন একমত হয়ে এবার খান্নাসকে জবাই করে শরীরের মাংসকে কেটে কুটে পাতিলে ভর্তি করে

রান্নাবান্না করে পেট ভরে খেয়ে ফেললেন। হযরত আদম (আঃ) এবার কাজে না গিয়ে বাড়ীতে বসে রইলেন। আর শয়তানের অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, এবার সে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে আমি একটু দেখবো।

ইবলিশ শয়তান ঠিক সময় হযরত আদম (আঃ) এর গৃহে উপস্থিত হল হযরত আদম শয়তানকে লক্ষ করে বললেন আমার অনুপস্থিতে নিজ বেটাকে নিয়ে খুব দাবা খেলেছ। এবার উপায় কি? আমরাতো দু'জন খান্নাসের মাংস রান্না বান্না করে খেয়ে ফেলেছি। ইবলিশীর আর জায়গা পাওনি? এখনতো ছেলে হারালে উপায় কি?

ইবলিশ শয়তান হযরত আদম (আঃ) কে লক্ষ করে বলল হে আদম! তুমি ঐ আদম না! যেই আদম সামান্য চক্রান্তে দুর পাক খেয়ে বেহেশ্ত হতে বের হয়ে আসছ। এখন তুমি আমার ছেলেকে দিয়ে দাবা খেলছ। একটু দেখ পরিনাম কি হয়।

এই বলে ইবলিশ শয়তান হযরত আদম ও বিবি হাওয়া উভয়কে সামনে রেখে ফুৎকার দিল হে খান্নাস! হে খান্নাস! উভয়ের সীনার মধ্য থেকে খান্নাস জবাব দিল বাবা! আমি আদম ও হাওয়ার সিনাতে আটকা পড়ে রয়েছি বের হতে পারছিনা। ইবলিশ শয়তান উত্তর করলো হে খান্নাস! এবার আর বের হয়েওনা আদম ও হাওয়ার অন্তরে লুকিয়ে থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কুমন্ত্রণা দিতে থাকো। এই চক্রান্ত খেলার পর হতে মানুষের সীনাই কুমন্ত্রণার কেন্দ্রস্থান হল।

সূরা নাসের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম কুরতবী এই ব্যাখ্যাটি স্বরচিত জামেউল আহকাম গ্রন্থে স্ববিস্তারে আলোচনা করেন।

খারেজী মাযহাব বা ইহুদী মাযহাব

খারেজী মাযহাবকে ইহুদী মাযহাব নাম করণ করা হয় এই জন্য যে, এ তথাকথিত মাযহাব খানার প্রণেতা ছিল মৌলবাদীশক্তির অন্যতম নেতা আবদুল্লাহ বিন সাবা একজন প্রখ্যাত ইহুদী। মুসলিম উম্মা ঐ মাযহাবকে খারেজী মাযহাব বা ইহুদী মাযহাব নামকরন করেছেন।

খারেজী মাযহাবের মূলনীতিতে রয়েছে শুধু আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও রবুবিয়াতের বিশ্বাসই ঈমান প্রতিষ্ঠার একক শর্ত। নবী রাসূল আওলীয়া বুজরগানগণ খারেজীদের নজরে অত্যন্ত ঘৃণিত এবং প্রত্যাখ্যান যোগ্য। সেই কারণে তারা স্বয়ং কাফের ইহুদী হয়ে স্বনামধন্য নবী রাসুলগণকে মুশরিক নামে আখ্যায়িত করতো। তারা আল্লাহ পন্থীর দাবীদার হয়ে সদা সর্বদা কুকার্য সম্পাদনে লিপ্ত থাকতো। খারেজীগণ মাযহাবী কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সেই যুগে ইরাক সংলগ্ন হারুরা নামক একটি বস্তিতে দারুত তাওহীদ নামে একটি সংসদ কায়েম করেছিল। যার সংসদ সদস্যের সংখ্যা ছিল অন্তত ৬০ হাজার। যার প্রধান দোয়াগো এর নাম ছিল মাসরার বিন তামীম (হাফেজে কোরআন) সহকারী মুরব্বীর নাম ছিল যায়েদ বিন হোসাইন।

প্রখ্যাত ইহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবা এর মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয় প্রখ্যাত মৌলবাদী ফরহাদ বিন নাওফিল। খারেজী মাযহাব এর ইমামগণের নাম যথাক্রমে এই : আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া ইবনে জুজী ও ইবনে কাইয়ুম প্রমুখ। খারেজী মাযহাবের উৎপত্তির সন হল ৩৭ হিজরী। এই হিজরী সনে হযরত আলী (রাঃ) প্রত্যেক খারেজী মৌলবাদী শক্তিগণের প্রায়কে সমুলে নির্মূল করেন।

ওহাবীদের মূলধন কিতাবুত তাওহীদ

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী প্রণীত কিতাবুত্‌ তাওহীদ নামের আরবী বই খানা নজদী পন্থীগণের নীতিমালার মূলধন। উক্ত বইয়ের প্রনেতার মৃত্যুর পর যদি বইখানাও অস্তিত্বহীন হয়ে যেত, আমার মনে হয় ওহাবী পন্থীদের নাম পর্যন্ত মুছে যেতো। ইসমাইল দেহলভী সাহেব বইখানার উর্দু অনুবাদ করে নজদীগণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেন। ইহা ছাড়া পুস্তক খানা আরবী ভাষায় লিখিত হওয়ার কারণে উহাতে কি রহস্য নিবদ্ধ আছে তা অনেকেই জানতনা। কিন্তু ভারত বিখ্যাত শরীর চর্চাবিদ পীর কেবলা জনাব সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভী সাহেব উক্ত ধর্মনাশা পুস্তকের অনুসন্ধান পেয়ে তার একজন খাছ মুরীদ ইসমাইল দেহলভীকে ইহার উর্দু ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ করে ভারত বর্ষে ওহাবী মিথ্যা মতবাদটিকে পুনঃ বিস্তার করে।

দেহলভী সাহেব পীরের নির্দেশ ক্রমে উক্ত পুস্তক খানার উর্দু অনুবাদ করে নাম রাখলেন তাকবীয়াতুল ঈমান। অর্থাৎ ঈমান শক্তকারী বই। কিন্তু বই খানা পাঠ করলে ঈমান শক্ত হওয়ার স্থলে ঈমানের মূল উৎপাঠন হয়ে যায়। কারণ বই খানার মধ্যে আম্বিয়া, আওলীয়া, সাহাবা ও বুজুর্গানেদ্বীন সমূহকে অপমান সূচক বাক্যে যেভাবে ধোলাই করা হয়েছে তা আরবের চিরাচরিত কোন কাফের মুশরিকও করেনি। বিশেষ করে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ হাবীবে খোদার অগণিত কুৎসা করা হয় বিশেষ ভাবে উক্ত পুস্তকটিতে। যেমন পুস্তক খানার বিভিন্ন স্থানে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) কে উপহাস করে বলা হয় তিনি মরে মাটি মিশ্রিত হয়ে গেছেন, তার দ্বারা ইহকাল পরকালে কখনো কারো উপকার হতে পারেনা। তিনি স্বশরীরে নূর ছিলেন না বরং তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ এবং মাটির মানুষ ছিলেন। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর

শানে মিলাদ মাহফিল সীরাত অনুষ্ঠান করা হারাম কাজ। মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেব ধর্ম কুৎসার স্বপক্ষে এবং নিজের প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে একবার দিল্লীর মাসজিদ প্রাঙ্গনে সুন্নী ওলামায়ে কেরামদের সঙ্গে বহছের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। সুন্নী ওলামাগণ যখন দেহলভীকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার দাবী যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) স্বশরীরে নূর ছিলেন না, তবে আল্লাহ পাকের কোরআনের মধ্যে কেন তাঁকে নূর ঘোষণা দেয়া হল ? ইসমাইল সাহেব প্রশ্নের জবাব না দিতে পেরে মঞ্চ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু জনতা মারমুখি হয়ে ইসমাইলকে মার ধর করতে চেয়েছিল।

আল্লাহ পাকের কি হুকুম এই ধর্ম কুৎসার পর হতে ইসমাইল সাহেবের বাক শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অন্তরের কুমন্ত্রনা শক্তি নষ্ট হয়ে ছিলনা। তাই তিনি অতি সংগোপনে তার পীরে কেবলাকে আল্লাহর হাতে বাইয়াত গ্রহন করতঃ শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি তথা খোদার আস্তানাতে কাটিয়ে দেন। অবশেষে তিনি পীরে কেবলার সঙ্গে শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওয়ানা দিলে ইউসুফ জর্গাজয়ী তাকে পাঠান রাজ্যে গুলি করে হত্যা করে।

জনাব মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব দিল্লীর মসজিদ প্রাঙ্গনে ইসমাইল দেবলভীর ধর্ম কুৎসার অপদস্থ ও নাজেহালকে গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করতে থাকেন। তিনি সংকল্প করলেন যে, ইসমাইল দেহলভী সাহেবের তাকবিয়াতুল ঈমানের নাপাক বিষয় বস্তুসমূহকে রূপান্তর করার জন্য জানে প্রানে উঠে পড়ে লাগলো এবং একটানা ওহাবী মাযহাবে এবং ইসমাইল সাহেবের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে অন্তত কয়েক ডর্জন ফতোয়া রচনা করেন। জনাব খলিল আহাম্মদ আম্বুটি, আশরাফ আলী থানভীকে নিজের সহযোগী রূপে নির্ধারণ করেন। এখন হতে ওহাবী মাযহাব আবার মাথা উত্তোলন করতে লাগল নতুনভাবে।

ওহাবী ফের্কার প্রধান পৃষ্টপোষক ইসমাইল দেহলভী সাহেব মৌলবাদী খারেজী মাযহাবের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন যার প্রমানে নিম্ন বাক্যটি।

جسکی لوجہہ کامل ہو اسکی گنتاہ وہ کام کرلیں ہے
جواوروں کی عبادت لیہوں کرسکتی ۔

মৌলবাদীগণের পাপের কার্যকারীতা বা তাসির শক্তি এত বেশী যে, উহার মোকাবিলায় ইসলাম পন্থীগণের ইবাদত বন্দেগীর তাসির শক্তি অতি তুচ্ছ। অর্থাৎ মৌলবাদের মোকাবিলায় ইসলাম ধর্ম কিছুনা।

ওহাবীপন্থীরা খারেজী মাযহাবের নিয়ম নীতি আইন কানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এতে কোন সন্দেহ নেই। সে কারণে ইমাম ইবনে আবেদীন (রহঃ) ফতোয়া শামীর তৃতীয় খন্ড ৩১৯ পৃষ্ঠার সমস্ত ওহাবীগণকে খারেজী মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত করে উভয় ফের্কাকে আগ্রাসী সন্ত্রাসবাদী জালেম ও ডাকু নামে আখ্যায়িত করেন।

ইসমাইল দেহলভীতো মৌলবাদীদের খারেজী মাযহাবকে মনে প্রাণে প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করেন। আর মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী, আশরাফ আলী থানভী ও খলিল আহাম্মদ আম্বুটি সাহেবান খারেজী মাযহাবের নাম পালটিয়ে দিয়ে ওহাবী মাযহাব নামকরণ করে হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। কোরআন পাকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাফসীরে সাবীর ২৫৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ওহাবী ফের্কাকে ডাকু সন্ত্রাসবাদী ও শয়তানের দল বলে আখ্যা দেন। (সংক্ষেপ)

গঙ্গুহীর ভাষ্যে ওহাবী ফের্কা

محمد بن عبد الوهاب نجدی کو لوگ وهابی کهتے
هیں ۔ وه اچها آدمی تها متبع سنت اور دیندار تها
عامل حدیث تها بدعت وشرک سے لوگوں کو روکتا تها
مگر تشدد اسکی مزاج میں تهی فقط رشید احمد دعاگو ۔
(فتاوی رشیدیه صـ ۹۲ صـ ۲۳۴)

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব বলেন যে, মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে মানুষ ওহাবী এবং নজদী পন্থী হিসেবে ঘৃণা করে। তবে সে আমার নিকট বড় ভাল মানুষ এবং সত্যবাদী দীনদার ধার্মীক মানুষ ছিল। সে মানুষকে শিরিক ও বেদআতী কর্মে লিপ্ত হতে দিতো না। তার ব্যবহার ছিল অত্যান্ত খারাপ মেজাজ ছিল খিটখিটে। উক্ত সমর্থন বাক্যের দ্বারা প্রমানিত হল যে, রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী একজন খাঁটি. ওহাবী ছিলো।

ইসলামী ফতোয়ার ভাষ্যে ওহাবী ঃ

(১) আল্লামা ইবনে আবেদিন বলেন, ওহাবীপন্থীরা ছিল মৌলবাদী আগ্রাসী শক্তি। তারা ছিল মক্কা মদীনা আক্রমণকারী। তারা মুসলমানদেরকে মুশরিক বেদআতী বলতো। তারা নবী, সাহাবী, ওলীগণের বৈশিষ্ট্য সমূহ মেনে নিতো না। সুন্নী ওলামা এবং সুন্নী আকীদা পন্থীগণ ছিলেন ওহাবীদের নজরে অতি ঘৃনিত। (ফতোয়া শামী)

(২) তফসীরে সাবী শরীফের গ্রন্থকার বলেন, ওহাবী ফের্কা হেজাজ ভূমির এক চরম পন্থী আগ্রাসী দলের নাম। তাদের কাঁধে শয়তান আরোহন করছিল। তারা কোরআন সুন্নাহর মনগড়া অর্থ করতো। হত্যা

খুন খারাবী হাইজাক আগ্রাসনী কাজে সদা সর্বদা লিপ্ত হত। তাদের আকীদা আর খারেজী ফের্কার আকীদার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা। (সাবী ২৫৫ পৃঃ)

(৩) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমেরী (রহঃ) বলেন, মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ছিল একজন লম্পট কুখ্যাত অনবিজ্ঞ ক্ষুদ্র জ্ঞানী মানুষ। সে মানুষকে কথায় কথায় কাফের বলতো। (ফয়জুলবারী)

হাদীসে রাসুল (দঃ)-এর ভাষ্যে ওহাবী

১। হযরত নবী করীম (দঃ) ফরমান, আরব ভূখন্ডের পূর্ব দিক (নজদ) হতে কতিপয় লোকের আবির্ভাব হবে যারা শুধু কোরআন পড়তে পারবে তবে কোরআনের মর্ম অর্থ কিছু বুঝবেনা।

২। ঈমান হিজাজের মধ্যে সীমিত, আর কুফর সীমিত পূর্ব দিকে নজদের মধ্যে সীমিত।

৩। যাদের বংশ এবং দেশের জন্য মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) দোয়া করেন নি। তার বংশ জাত সকলেই অভিসপ্ত।

খারেজী বা ইহুদী মাযহাবের প্রথম সমর্থক ঃ জনাব রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী

০ হিন্দুস্থানের মধ্যে খারেজী মাযহাব আনয়ন কারীর নাম ছিল মোঃ ইসমাইল দেহলভী। রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব বলেন খারেজী

মাযহাবপন্থী ইসমাইল দেহলভী সাহেব অত্যন্ত সত্যবাদী ন্যায় পরায়ণ খাঁটি মানুষ ছিলেন। তিনি খারেজী মাযহাব বিস্তারের লক্ষে ওহাবী নীতিমালার একটি আরবী বইকে উর্দু ও হিন্দীতে অনুবাদ করেন, মূল বইখানা যেমনি শুদ্ধ তেমনি অনুবাদও একেবারে খাঁটি। উক্ত দু'টি বইকে আমল করার জন্য সঙ্গে রাখার উপদেশ দিচ্ছি।

গঙ্গুহী সাহেব আরো বলেন, আমার উল্লেখিত উপদেশ এবং নির্দেশের উপেক্ষা করে বই দু'টির যে ব্যক্তি সমালোচনা বা অবহেলা করবে সেই ব্যক্তি খাটি মুশরিক এবং গোমরাহ। (ফতোয়া রশিদিয়া)

০ অভিশপ্ত নজদের অধিবাসী মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব, যাকে মানুষ ওহাবী বলে ঘৃণা করে তিনিও সত্যবাদী এবং গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন। সে সব সময় হাদীসের সুন্নতের অনুসরণ করতো এবং বেদআদ শিরিকের কথা একেবারে শুনতে পারতেন না। তবে তার মেজাজ ছিল খিটখিটে। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া ৯৬–২৩৭ পৃঃ)

ওহাবী মাযহাবের হলপ নামা

سن لو! حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے
نکلتا ہے اور میں بقسم کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں
ہدایت ونجات موقوف ہے میری اتباع پر (تذکرۃ
الرشید گنگوہی)

প্রচলিত শাফেয়ী হানাফী সকল মাযহাব বাদ দিয়ে আমার মাযহাবে দীক্ষিত হও। হে দেওবন্দীগণ! তোমরা মনে রেখো আমি রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর পবিত্র মুখ হতে যে কথা বের হয় তা একেবারে খাটি এবং সত্য। আমি তোমাদের বিশ্বাসে জন্য আল্লাহ পাকের কছম করে বলছি, এই ফাসাদের যামানায় হেদায়েত ও নাজাত আমার কথার অনুসরণের উপর নির্ভর করে। (তাযকিরাতুর রশিদ)

গঙ্গুহী সাহেব যত কছম করে বক্তব্য পেশ করুক না কেন কোন দেওবন্দী তার কথায় বিশ্বাসী হলনা। প্রকাশ্য শব্দে প্রত্যেক দেওবন্দী বলতে শুরু করলো যে, রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী নিসন্দেহে কাফের এবং ধর্মচ্যুত। ঠাকুর দাদা দিশে হারা হয়ে তার একান্ত বন্ধু জনাব খলিল আহাম্মদ আম্বুটির সঙ্গে সলা পরামর্শ করলেন তখন আম্বুটি সাহেব শান্তনা দিলেন যে, আপনি কাফের হবেন কেন? আপনাকে আমি মুসলমান বানিয়ে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ।

দেওবন্দী মাযহাবে ভোট দিন

گنگوہی کی بات واقعی اس قابل ہوں کہ اس پر
اعتماد کیا جاوے اور ان سب کو مذہب قرار دیا جائے
(المہند صفحہ ۵۰ سطر ۳)

জনাব আম্বুটি সাহেব শান্তনা বাক্যে বললেন তোমাদের বড় মুরব্বী জনাব গঙ্গুহী সাহেবের উপর উল্লেখিত উপদেশ বাক্যেরদ্বারা বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই। সত্যিই তার উপদেশ বাক্যাবলী অতি নির্ভর যোগ্য কালাম। অর্থাৎ তিনি দার্শনিক উক্তি করে দেওবন্দীগনের জন্য একটি নতুন মাযহাব প্রনয়ন করতে চান। যার নাম হবে ওহাবী মাযহাব বনাম দেওবন্দী মাযহাব।

খলিল সাহেবের শান্তনা বাক্য দ্বারা দেওবন্দীগণ বুঝতে পারলেন যে, রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী নিতান্ত খাটি এবং হক মানুষ। তার প্রণীত মাযহাবে সকলেরই প্রবেশ করা অতি প্রয়োজন। নচেৎ জাহান্নামে যেতে হবে। দোযখে যাবার ভয়ে সকল দেওবন্দ প্রবাসী গুরু গুরু করে দেওবন্দী মাযহাবে প্রবেশ করতে লাগলো, এটা দেওবন্দী মাযহাবের উৎপত্তির ঘটনা।

আশরাফ আলী থানভীর ঘোষনা

میں لوکھا کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس دس ہزار روپیہ ہو سبکی تنخواہ کردوں پھر خود سب وہابی بنجائیں۔ (افاضات تھانوی جلد ۳ - ص ۶۱ - سطر ۸)

হে দেওবন্দীগণ। তোমরা অবগত আছ যে, দেওবন্দী ও ওহাবী এই দু'টি মাযহাবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই মাযহাবটি আমার মনের মাযহাব। আমি আশরাফ আলী বলছি আমার কাছে যদি ১০ হাজার টাকা থাকতো তবে সবটাকা দেওবন্দী ও ওহাবী মাযহাব প্রচারের ক্ষেত্রে খরচ করতাম।

আশরাফ আলী থানভী সাহেবের উক্ত ভাষণের উপর পূর্ণ আস্থাবান হয়ে দেওবন্দীগণ ওহাবী মাযহাব বনাম দেওবন্দী মাযহাবে প্রবেশ করতে শুরু করলো।

সহযোগী ফতোয়া ঃ রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব জনাব থানভী সাহেবের উক্ত ভাষণ দেয়ার পর পাল্টা ফতোয়া মারলেন। হে দেওবন্দীগণ। ওহাবী মাযহাব ও দেওবন্দী মাযহাবের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। ওহাবীগণ যেমন শুধু আল্লাহ পাককে বিশ্বাস করে থাকে রাসূলকে পূর্ণ বিশ্বাস করেনা তদ্রূপ দেওবন্দীগণও আল্লাহর বিশ্বাসী রসূলের পূর্ণ বিশ্বাসী নয়। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া ১০ পৃঃ)

দেওবন্দী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

وهم مریدان را تلقین داده که روح شیخ مطلقه مقید بیک مکان نیست ... ... شیخ را به قلب حاضر اورده بلسان حال سوال کنند الخ۔ (امداد السلوک مصنفه رشید ص۹ - سطر ۱)۔

জনাব মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসার বানী হওয়ার সাথে সাথে দেওবন্দী মাযহাবের অন্যতম ইমামও ছিলেন। তিনি কলে কৌশলে হেদায়েত নাজাতের ভয় দেখায়ে হিন্দুস্থানীগণকে দেওবন্দী মাযহাব ভুক্ত করার জন্য নিম্ন পাঁয়তারা শুরু করেন।

হে দেওবন্দীগণ! তোমরা আমার মত শেখের মুরীদ। মৃত্যুর পূর্বে আমি যেমন তোমাদের ঘাড়ে পাশে বিদ্যমান আছি তেমনি মৃত্যুর পর ও আমি তোমাদের আশে পাশে থাকবো ইনশা আল্লাহ। মরার পর আমার প্রাণ সর্বস্থানে সর্বস্তরে বিচরণ করবে। তোমরা কোন বিপদে পড়ে গেলে আমাকে ডাকলে আল্লাহর ফজলে তখনই বিদ্যুতের মত তোমাদের ঘাড়ে উপস্থিত হব। দেওবন্দীগণ! আমিই একমাত্র তোমাদের মুশকিল কুশা।

জনাব রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর ফারসী ভাষায় উল্লেখিত ঘোষণাটি প্রকাশিত হওয়ার পর দেওবন্দ অধিবাসীগণ তাকে খোদার স্থানে রেখে সম্মান করতে লাগলেন। এই গোমরাহীতে সাধারণ অসাধারণ প্রত্যেক দেওবন্দী আটকাপড়ে গেল। গঙ্গুহীর মৃত্যুর পর জনাব মৌলভী মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী গঙ্গুহীর শান প্রকাশের জন্য কতগুলো উর্দু কবিতা আবৃত্ত করেন। যেমন ঃ خدا ان کا مربی ہے وہ مر
بی تھے خلائق کے

অর্থাৎ রশিদ আহাম্মদ পীর কেবলা সাহেবের প্রভু ছিলেন স্বয়ং খোদাওয়ান্দে তায়ালা। আর জনাব গঙ্গুহী সাহেব সমস্ত মাখলুকাতের খোদা ছিলেন। নাউজুবিল্লাহ। কবিতা :

جدھر کو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا ۔
مرے قبلہ مرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی (مرثیہ
محمود الحسن ص-١٢ ۔

গঙ্গুহী সাহেব যেদিকে ধাবিতে হতেন সেই দিকে আল্লাহও ধাবিত হতে বাধ্য হতেন। গঙ্গুহী সাহেব দেওবন্দীগণের নামাজের কেবলা এবং কা'বাও ছিলেন। তার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল তিনি আল্লাহর চাইতে বেশী হক্কানী ছিলেন। কারণ আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন কিন্তু তার পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব ছিল।

সীতাকুণ্ড - দেওবন্দ

ভারত উপমহাদেশে বহুহিন্দু তীর্থস্থান রয়েছে তন্মধ্যে কতিপয় স্থান এক শব্দ দ্বারা গঠিত। যেমন গয়া-কাশী, মথুরা ইত্যাদি। আর কতিপয় তীর্থ স্থানের নাম দু'টি সংযুক্ত শব্দ দ্বারা গঠিত। যেমন বিন্দাবন বার কুণ্ড নাভি-কুণ্ড রাধা কুণ্ড সীতা-কুণ্ড এবং দেও-বন্দ ইত্যাদি।

সীতাকুণ্ড : সীতা অর্থ সোজা রেখা। কুণ্ড অর্থ গর্ত-জলাশয় ও অগ্নিজল। পারিভাষিক অর্থে সীতা-কুণ্ড ঐ জলাশয় স্থানকে বলা হয় যেখানে মিথিলার রাজা জনক কৃষির কার্য সম্পাদন করে। হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বলেন মিথিলার রাজা জনক তিনি লাঙ্গল চষতে গিয়ে একটি মেয়ে পান সেখানে। তিনি এই মেয়েটির নাম রাখেন জানকী। এই জানকীর সঙ্গে অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। পরে তার নাম রাখা হয় সীতা। মহামুনি সীতা ও রামচন্দ্রের

নামে এই স্থানটি সীতাকুণ্ড নামে পরিচিতি লাভ হয়। সেখানে বর্তমান শিবলিঙ্গ উপস্থাপিত আছে। হিন্দু সম্প্রদায় সেখানে গিয়ে লিঙ্গ পূজা করে। উক্ত তীর্থস্থানটি চট্টগ্রাম হতে ২০/২২ মাইল উত্তরে সীতাকুণ্ড উপজেলায় অবস্থিত আছে।

দেওবন্দ : দুই শব্দ বিশিষ্ট সংযুক্ত নামের একটি নাম হল দেওবন্দ। ইহা সীতাকুণ্ড শব্দের অনুরূপ অর্থ বহন করে। "দেও" শব্দটির অর্থ হল শয়তান ভূত পেতনী, জঘন্যতম পাপাত্মা। দৈত্য দৈত্যারি দৈত্যের শত্রু, বিষ্ণু ইত্যাদি।

"বন্দ" শব্দের অর্থ হল দল জামাত গোষ্ঠী। দেও এবং বন্দ উভয় শব্দকে একত্রিত করে অর্থ করলে সমষ্টির অর্থ দাঁড়ায় শয়তানের দল বা ভূতের পেতনীর গোষ্ঠী। রোমানীয়াতে দেওবন্দ শব্দের অনুরূপ বালবাক নামে একটি শহর আছে। বাংলা ভাষায় যার অর্থ হয় ভূতের শহর। আমাদের জানা নেই যে, সেই শহরে আদৌ ভূত ছিল কিনা। তদ্রূপ আমাদের জানা নাই যে, হিন্দুস্থানের ই, উ, পিতে দেওবন্দের স্থানে শয়তান ভূত পেতনী কখনো বাস করতো কি না।

হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বলেন "দেওবন্দ" হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহাসিক তীর্থ স্থানের নাম। তথায় তৎকালে হিন্দু সম্প্রদায় উপস্থিত হয়ে পূজা পাঠ নবভব স্ব স্ব ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করতো। সে স্থানে অবস্থিত মন্দিরের চতুর্দিকে তৎকালে শত শত পতিতা বসবাস করতো। পূর্ব হতে সেখানে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক আড্ডাখানাটি আজও অবস্থিত আছে। দেওবন্দ যাই থাকুকনা কেন আল্লাহর রহমতে দেওবন্দী মুরব্বীগণ তথায় সেই নামে একটি মাদ্রাসা কায়েম করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

মুরব্বীগণ বলেন যে, দেওবন্দ মাদ্রাসার স্থান নির্ধারক ছিলেন স্বয়ং মহানবী হাজুরে পাক (দঃ)। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে লাঠি দ্বারা

মাদ্রাসার সীমা রেখা নির্দিষ্ট করেছেন। আবার মুরব্বীদের আকীদা বিশ্বাস ছিল যে, প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর কর্ম ক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে এবং যদি কেহ বলে যে, হুজুরে পাক (দঃ) ইন্তেকালের পর কোথায় উপস্থিত হয়েছেন এইরূপ বিশ্বাস করা সরাসরি শিরিক তুল্য কর্ম। তাই মুরব্বীগণ মিলাদ মাহফিল হতে গুরগুর করে বের হয়ে পড়েন।

আবার দেওবন্দী মুরব্বীগণ বলেন হুজুরে পাক (দঃ) দেওবন্দে এসে উর্দু হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। কারণ দেওবন্দী শিক্ষকগণ উর্দু হিন্দী ভাষা চমৎকার জানেন।

দেওবন্দে রাসুলে পাকের তশরীফ আনয়ন বা শুভাগমন ঃ

ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب
میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھکر
پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئی ۔ آپ تو عربی
ہیں فرمایا کہ جب سے علمائے مدرسہ دیوبند سے
ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آگئی (براہین قاطعہ
ص۲۶ ۔ سطر۹)

একজন দেওবন্দী বুজুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নযোগে প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ)-এর সঙ্গে দিদারলাভ করেন। সেই দিদারের মধ্যে তার সঙ্গে হুজুর (দঃ) স্বয়ং গর গর করে উর্দু ভাষায় কথা বার্তা বলতে দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন-আপনিতো আরবী ভাষাভাষী তবে উর্দু ভাষা শিখলেন কোথা হতে? তদুত্তরে হুজুরে পাক (দঃ) বললেন আরে মিয়া। আমি বহু পূর্ব হতে দেওবন্দী ওলামাগণের সঙ্গে উর্দু শিক্ষালাভের জন্য যোগাযোগ করে আসছি। এই মিলামিসার পর হতে আমি উর্দু ভাষায় কথা বার্তা বলতে সক্ষম হই। নাউজু বিল্লাহ।

পাঠকবৃন্দ ঃ গঙ্গুহী সাহেব তার স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদ্রাসার গুরুত্ব বৈশিষ্ট বর্ণনা করলেন তৎসঙ্গে বিশ্বনবী হুজুর (দঃ) কে হেয়ও হীন করে দেখলেন। এইরূপ হেয়ও হীন করা ধর্ম অবমাননা নয় কি? কোরআন শুধু হুজুরের উপর নাজিল হয়, জিব্রাঈল (আঃ) কোরআনের আয়াত নিয়ে হুজুরে পাকের দ্বারেই আসতেন। তিনি যদি মদীনাতে থাকতেন তাহলে হযরত জিব্রাঈল মদীনাতে চলে যেতেন এবং মক্কাতে থাকলে মক্কাতে যেতেন। তিনি জীবনে একদিনও জিব্রাঈলের নিকট গিয়ে আল্লাহর বাণী আনেন নাই। সেই ক্ষেত্রে তাঁর উর্দু শিক্ষার জন্য দেওবন্দে উপস্থিত হওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে? দেওবন্দীগণ মনে করে যে, তাদের স্বপ্নের মর্যাদা নবীদের ওহী হতে বেশী। তারা স্বপ্ন খেলা খেলে তাবলীগী দলের উদ্ভব ঘটান। এসব ধর্মের নামে পাঁয়তারা নয় আর কি?

হারামকে হালাল করার সঠিক তরীকা ঃ

حرام مال حلال کرانے کے سلسلہ میں تھانوی نے ایک
حیلہ لکھا ہے وہ یہ کہ اگر کسی حلال مال سے قرضہ
لیکر مسجد یا مدرسہ میں لگا سکتے ہیں ۔ (الافاضات
ج۲ ۔ ص۲۹ ۔ سطر۲)

এক ব্যক্তি আশরাফ আলী থানভী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল যে, কোন সন্দেহ নেই যে, পতিতার কামাই হারাম। তবে পতিতা (বেশ্যাগির) আগ্রহ সহকারে মাদ্রাসা মসজিদে দান করতে চাইলে কি হুকুম? থানভী সাহেব বললেন যে, ইসলামের চিন্তাবিদ দার্শনিকগণ হারাম মালকে হালাল করার একটা পন্থা বের করেছেন উহা এই যে, পতিতা নিজ দেহ বিক্রয় করা হারাম কামাইকে কোন হালাল মালের সঙ্গে বিনিময় করতঃ মাদ্রাসা মসজিদে দান করতে পারে। যেমন একখানা কাপড় খরিদ করে মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষককে দিল তারা জামা পাগড়ী তৈরী করল অথবা একটি গাভী খরিদ করে দিল মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকগণ দুধ বা মাংস খেলো ইত্যাদি।

সুদের টাকা হালাল করার হীলা ঃ

মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি থানভী সাহেবের নিকট একথা জানতে চাইলো যে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমার নিকট অনেক সুদের টাকা জমা হয়ে গেছে। এখন আমি চাই যে, উহা সৎ পথে ব্যয় করব। এই সম্পর্কে আপনার রায় কি? জনাব থানভী সাহেব পত্রের মাধ্যমে ফতোয়া প্রেরন করলেন ঃ که اسکو لیکر هندوستان آجاؤ সেই সুদের টাকা সমূহ সঙ্গে করে হিন্দুস্তান (দেওবন্দ) এসে পড়। পতিতার কামাই হালাল হতে পারলে সুদের টাকা হালাল হবেনা কেন? (ইফাযা ৩য় খন্ড ৭৭ পৃঃ)

হারাম দুধ ও মাংস হালাল করার সঠিক পদ্ধতি ঃ

ظاهر شد که اکل او و شرب لبن او همه جائز بلا کراهت هست پس در صورت مسئوله از شان به همه چیزے العوض له کرده شود . چونکه مالک او گوارہ نکند . (۱۱ رجب سنه ۱۳۲۱ . امداد الفتاوی تهانوی ج-۲ . ص-۱۵۵ سطر ۱۰)

ফতোয়া ঃ থানভী সাহেবকে কেহ জিজ্ঞাসা করলো যে, আমাদের মধ্যে কোন একজন মানুষ গাভীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে এখন সেই ব্যক্তি ও গাভীকে কি করতে হবে?

থানভী সাহেব বললেন যে, জেনাকৃত গাভীর মাংস খাওয়া এবং দুধ পান করা নিঃসন্দেহে জায়েজ। গাভীটাকে কি করতে হবে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন যে, উহাকে স্বতন্ত্র বিধানের আওতাধীন রাখতে হবে। কারণ গাভীতো বেজবান যার মালিক অন্য লোক। অন্য লোকের গাভীকে জবাই করা দুরস্ত হবে না। জনাব থানভীর এই ফতোয়া দ্বারা এ কথাই প্রতিয়মান হচ্ছে যে, এক ব্যক্তি একটা গাভী খরিদ করে সকাল বিকাল দুধ পান করলো এবং জেনার সময় জেনা করলো, তাহলে ঐ ব্যক্তির আর বিবাহের প্রয়োজন রইল কোথায়।

জেনাকৃত গাভীর সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ফতোয়া শামীর গ্রন্থকার বলেন, تا لا لحرق ايضا, জেনাকৃত গাভীটাকে জবেহ করে মাংসগুলো জ্বালিয়ে দিতে হবে। জেনাকৃত গাভীর মাংস খাওয়া এবং দুধ পান করা একেবারে হারাম। তবে জনাব আশরাফ আলী থানভী এই ইসলামী ফতোয়ার বিপক্ষে হালালের নির্দেশ জারী করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, হিন্দুস্থানের মধ্যে গাভীর মর্যাদা অত্যাধিক ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়গন গাভীর পুজা পাঠ করে থাকে। যদি থানভী সাহেব জেনাকৃত গাভীর মাংস বক্ষণের নির্দেশ দিতেন তাহলে দেওবন্দের হিন্দুগণ থানভীর উপর অসন্তুষ্ট হত। তিনি মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

নোট ঃ মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেবকে রহমতুল্লাহ বলুক আর না বলুক তা ভক্তবৃন্দের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে থানভী সাহেব জীবনে একটি কথাও সঠিক বলেন নি। বেহেশতী যিওর নিঃসন্দেহে একটি খাটি কিতাব। তবে কিতাব খানা তার রচিত নয়। বরং উহা শিবির আলী ও জমির আহাম্মদ (রঃ) এর হাতের লেখা থানভী সম্পর্কিত উন্নত পুস্তক।

কাকের মাংস হালাল করার হীলা ঃ

দেওবন্দ মাদ্রাসার বানী জনাব মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এতদ্দেশে মানুষ কাকের মাংস খাওয়া সম্বন্ধে নানা কথা বলে। এই ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের প্রকৃত নির্দেশ কি ?

জনাব গঙ্গুহী সাহেব ফতোয়া দিলেন, মানুষের কথা বাদ দাও, আমার নির্দেশ হল কাকের মাংস খেলে সাওয়াব হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

"الجواب" ثواب هوگا - فقط، رشيد احمد (فتاوى رشيديه صـ ١٣٠) -

কাকের মাংস হারাম হওয়া সম্বন্ধে কোরআন সুন্নাহর বিধান

(١) يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حللا طيبا (القران)

(٢) عن ابن عمر قال من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات (ابن ماجه صـ ٢٤١)

(٣) عن عائشة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحية فاسقة والعقرب فاسق والفارة فاسقة والغراب فاسق (مسلم شريف كتاب الحج)

অর্থ আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ ঃ হে মুমীন মুসলমানগণ, হালাল বস্তু ভক্ষণ কর। কাকতো হারাম।

২। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন কাক খাবে কে ? যাকে রাসূলে পাক (দঃ) অখাদ্য রূপে নাম করণ করেছেন। আমি হাদীস বর্ণনাকারী কছম করে বলছি, যে, কাক পাক ও পবিত্র পাখী নয়। কিন্তু দেওবন্দীগণ বলেন, যে, আমরাই মাত্র কাক খেতে পারব। কারণ আমরা পবিত্র এবং অপবিত্রের মধ্যে ভেদ বিচার করিনা।

৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সাপ ঘৃণিত ও অখাদ্য, তদ্রূপ বিচ্ছু, ইদুর, কাকও ঘৃণিত। (মোসলিম শরীফ)

দেওবন্দী মাযহাবে কাক খাওয়ার যৌক্তি ঃ

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব কাকের মাংস ভক্ষণ করলে সাওয়াব হবে, তার এই ইসলাম পরিপন্থী ফতোয়া দেয়ার মূল উৎস হল হিন্দু ধর্মের সঙ্গে দেওবন্দী মাযহাবের মধ্যে একাত্মতা বজায় রেখে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলা। হিন্দু ধর্মে কাকের বহু প্রশংসা রচিত আছে। যেমন তুলসী দাস প্রণীত রামায়ন গ্রন্থের ৭৬০ পৃষ্ঠায় কাক পাখীকে দেবতা আখ্যায়িত করা হয়। একদিন এক ভক্ত হিন্দুকে অগ্নি দগ্ধ করার পর সে কাকেরের ছবি ধারণ করে ফেলে। তখন হিন্দুরা কাক পাখীর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে থাকে। যেমন বলে হে আমাদের কাক দেবতা। তোমার উপর আমাদের অটল ভক্তি শ্রদ্ধা রয়েছে তুমি আমাদের উপর আশির্বাদ গ্রহন কর। কাক পাখিটি হিন্দু ভক্ত বৃন্দের একথা শুনে সুমরণ ও কির্তন করতঃ উড়িয়ে শ্মশান ত্যাগ করে।

জনাব মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব হিন্দু ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্ব উপলব্ধি করে হুজুর (দঃ) এর অমর বাণীর একটুও তোয়াক্কা করলেন না। রাসূলে পাক (দঃ) কাক ঘৃণিত পাখী রূপে অভিহিত

করেছেন। জনাব গঙ্গুহী সাহেব উহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কাক খাওয়া সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা দিলেন। (নাউজুবিল্লাহ)

পাখীর মধ্যে কাক পাখী নাফরমান। হযরত নূহ (আঃ) তুফান বন্ধ হওয়ার পর যখন কাককে পানির পরিমানের খবর আনার জন্য পাঠালেন তখন কাক পানির খবর না এনে মরা লাশের মাংস খাওয়া শুরু করে দেয়। কাকের এ আচরণে হযরত নূহ (আঃ) ক্ষুব্ধ হয়ে বদদোয়া দিয়ে ছিলেন। কাকের পরিবর্তে পানির খবর আনার জন্য কবুতরকে পাঠালেন। কবুতর পানির সঠিক দিক দর্শন করে এসে হযরত নূহ (আঃ) কে খবর দেয়ার পর তিনি কবুতরের জন্য দোয়া করেন।

দেওবন্দী উস্তাদ সাগরিদের লড়াই, কিতাবে "হাপ্ত মাসআলায়" আগুন ঃ

দেওবন্দী মৌলভীগণ জন্মগত ভাবে মিলাদ সীরাত ও কেয়ামের গোঁড়া বিরোধী। তারা ওয়াজ নসিহতের মধ্যে প্রকাশ্য বয়ান করেন যে, মিলাদ শরীফ পালনকারী বেদআতি এবং মুশরিক। কিন্তু তাদের প্রসিদ্ধ গুরু, মহামান্য দেওবন্দী সনদ বিতরণকারী প্রসিদ্ধ উস্তাদ স্বয়ং তিনি আগ্রহ সহকারে মিলাদ অনুষ্ঠান করতেন, ইহাকে সাওয়াব করতেন। যিনি মিলাদ ও কিয়ামকে পুণ্যের কাজ বলতেন, তিনি হলেন হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী (রঃ)। তাঁর কতিপয় ছাত্র যেমন মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী, মৌলভী খলিল আহাম্মদ আম্বুটি, মৌলভী আশরাফ আলী থানুভী প্রমুখ হাজী সাহেবের বিরুদ্ধে চরম পন্থা অবলম্বন করে পীরে কামেলকে মিলাদ কেয়াম পছন্দ করার কারণে ঘৃণা করতে লাগল। তবে মৌলভী আশরাফ আলী থানভী কানপুর মাদ্রাসার শিক্ষক থাকা কালীন

তথায় মিলাদ শরীফকে সাওয়াবের কাজ হিসেবে নিজেও পালন করেছিলেন আর মিলাদ বিরোধীবাদিদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে ছিলেন। তবে জনাব গঙ্গুহী সাহেবের খপ্পরে পড়ে পরে তিনিও মিলাদ শরীফকে হারাম বলতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত মিলাদ কেয়ামকে কেন্দ্র করে উস্তাদ সাগরিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। উস্তাদ কোন এক স্থানে তাশরীফ নিয়ে মিলাদ অনুষ্ঠান করে আসার পর পর উল্লেখিত বিদ্রোহ ছাত্রগণ সেখানে গমন করে বলতেন হাজী সাহেব একটি হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে গেছেন। তাঁকে আপনারা কখনও ওয়াজ নছিহতের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করবেন না। বারংবার এই রূপ কুৎসা নীতি এবং অপ প্রচারের দরুন হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) বিভিন্ন স্থানে অপদস্ত হতে লাগলেন। হাজী সাহেবের বিদ্রোহী ছাত্র গঙ্গুহী সাহেব মিলাদ ও কেয়ামকে হারাম বেদআতে সাইয়্যাহ নাম দিয়ে একটি ফতোয়া রচনা করে গ্রাম গঞ্জে ভ্রমন করে হাজী সাহেবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অপ প্রচারে লিপ্ত হয়ে গেল। হাজী সাহেব দিশে হারা হয়ে মিলাদ কেয়ামের স্বপক্ষে একটি বিস্তারিত পুস্তক রচনা করেন যার নাম "হাপ্ত-মাসায়েল"। হাজী সাহেব কিতাব খানা রচনা করে হিন্দুস্থানের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ শুরু করলেন। আর কিছু সংখ্যক কিতাব বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে তাঁর একান্ত ভক্ত ছাত্র জনাব মৌলভী আবদুস সামী সাহেবের নিকট প্রেরণ করলেন। কিন্তু গঙ্গুহী সাহেব উক্ত কিতাব সমূহকে সেখান থেকে এনে একত্র করে অগ্নিদগ্ধ করলো। কিতাব পোড়ার খবর শুনে হাজী সাহেব গঙ্গুহীকে অন্তর খুলে বদদোয়া করলেন। যার কারণে গঙ্গুহী সাহেব মাতালের ভেসে লুঙ্গি দিয়ে পাগড়ী বেঁধে উস্তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করলো।

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব মিলাদ কেয়াম হারাম প্রমাণ করার জন্য একান্ত বন্ধু মৌলভী খলিল আহাম্মদ আম্বুটি সাহেবকে ভাওয়ালপুরের ওয়াজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি সে

স্থানে ঠিক সময় উপস্থিত হয়ে মিলাদ কেয়ামকে হারাম বললেন। তখন জনতা খলিল আহাম্মদ আম্বুটিকে নাজেহাল করার জন্য মারমুখি হয়ে গেল। খলিল সাহেব কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করে আবার রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর আস্তানায় উপস্থিত হয়।

জনাব রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব খলিল আহাম্মদ আম্বুটির অপমানের কথা শুনে কহর করে বললেন, এবার দুদিকের একদিক করব ইনশাআল্লাহ। জনাব খলিল আহাম্মদ আম্বুটিকে নির্দেশ দিলেন যে, মিলাদ কেয়ামকে হারাম প্রমাণ করে আরো কতিপয় ধর্মনাশা উক্তি সম্বলিত একটি কিতাব রচনা কর। জনাব গঙ্গুহী সাহেবের নির্দেশক্রমে খলিল আহাম্মদ সাহেব براهين قاطعه (বারাহীনে কাতেয়াহ) নামে একটি পুস্তক রচনা করলো। যার উল্লেখ যোগ্য বিষয় বস্তুগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন তবে বলেন না।

২। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) নূরের তৈরী ছিলেন না। বরং তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন, তিনি আমাদের তুলনায় বড় ভাই এর মর্যাদায় ছিলেন।

৩। মহানবী রাসূলে পাক (দঃ) এর জ্ঞান বুদ্ধি শয়তানের চেয়েও কম ছিল।

৪। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) রাহমাতুল লিল আলামীন ছিলেন তবে একক ছিলেন না।

৫। প্রচলিত মিলাদ কেয়াম একেবারে হারাম ও বেদআতে সাইয়্যাহ। মিলাদ মাহফিল পালনকারী মুশরিক তুল্য ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো অন্তত শতের ঊর্দ্ধে কুফরী কালাম সম্বলিত কটুক্তি দ্বারা উক্ত ধর্মনাশা বইখানা রচনা করেন।

হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) দেখলেন যে, জনাব রশিদ ও জনাব খলিল সাহেবের দ্বারা সমগ্র হিন্দুস্থানে কুফরী নীতি বিস্তারিত হচ্ছে তখন অগত্যা অপারগ তিনি তাঁর দু'জন প্রখ্যাত বিজ্ঞ ছাত্রকে নির্দেশ দিলেন যে, গঙ্গুহী ও খলিল দ্বারা রচিত বই খানার জবাবে স্ববিস্তারে এক খানা কিতাব রচনা কর।

আল্লামা আবদুর রহমান দাস্তেগীর ও আল্লামা গোলাম ফরিদ (রহঃ) উস্তাদের নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতঃ রশিদ ও খলিল রচিত বই খানার রদ করণ বা জবাব স্বরূপ تقديس الوكيل عن توهين الرشيد والخليل নামে স্ববিস্তারে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। হাজী সাহেব গ্রন্থখানা দেখে দু'জন ছাত্রের প্রশংসা করেন।

তাকদীসুল উকিল গ্রন্থখানা ৪০০ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত। প্রথম হতে ১১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিশ্বনবী হুজুরে পাক (দঃ) এর শান ও বৈশিষ্টকে কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত করা হয়। ১১৮ পৃঃ হতে ৪০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তাওহীদ ও রবুবিয়াতের আলোচনা করা হয়েছে।

দেওবন্দী মাযহাব মৌলভী ইসলাইল দেহলভী খারেজী ঃ

মৌলভী ইসমাইল সাহেব দিল্লীর শাহ্ বংশে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ইমামে আহলে সুন্নত শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) এর নাতি এবং শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) এর ভাতিজা ছিলেন। তিনি চাচার উপর রাগ করে অভিশপ্ত নজদ প্রদেশের নজদী আকীদাকে হিন্দুস্থানে এনে ওহাবী আকীদা নামকরণ করেন। ওহাবী আকীদার পাশা পাশি তিনি তরীকত শিক্ষার নামে নিজ পীর

সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভীকে আল্লাহ পাকের হাতে বাইয়াত করান। তার পর হতে হিন্দুস্থানের মধ্যে ভন্ড পীর মুরীদির সিলসিলা কায়েম হল।

ইসমাইল সাহেব শুধু খোদা পন্থী ছিলেন। প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) এর একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি হিন্দুস্থানে মৌলবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের একমাত্র বিস্তারক হিসেবে প্রসিদ্ধ।

ইসমাইল কর্তৃক ধর্মনাশা আকীদা

১। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের রাসুল ছিলেন। এখন যখন মরে মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছেন তখন তিনি ইজ্জত সম্মান, প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের আধকারী রইলেন কি করে। বর্তমানে তিনি নবী (দঃ) সাধারণ মনুষ্যের সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

২। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে আল্লাহ পাক বিন্দু পরিমানও গায়েবের এলেম প্রদান করেন নাই।

৩। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে হাজির নাজির বিশ্বাস করা শিরিকী কাজ। তাই ইয়া নাবী আল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা একেবারে যায়েজ নাই।

৪। বর্তমান যুগের সকল মানুষ কাফেরে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ।

৫। রওজা শরীফ জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হওয়া হারাম। যদি কোন ব্যক্তি এই নির্দেশ অমান্য করবে সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুশরিক।

৬। ইমাম হানাফী, ইমাম মালেকী, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম হাম্বলী মাযহাবীগণ সকলেই (বিদআত)।

৭। আল্লাহ পাকের বিশ্বাস শুধু ঈমানের জন্য। মোহাম্মদ (দঃ) এর বিশ্বাস শিরিকের জন্য।

৮। হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর মর্যাদা বড় ভাইয়ের তুল্য। আওলিয়া বুজর্গানেদীন চামারের তুল্য।

৯। বুজর্গানে দীনের তরীকত প্রচলন ইহুদী মতবাদ সমতুল্য।

১০। ওরশ মিলাদ মাহফিল করে নবী ও আওলীয়াগণকে সম্মান করা কুফর ও শিরেকী কর্ম বিশেষ।

১১। নামাজের মধ্যে অর্থাৎ আত্তাহিয়াতুর মধ্যে প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) মহব্বতের সহিত সালাম দেওয়া গরু, গাধাকে মহব্বত করার তুল্য।

১২। ইহ কালে নবীর কোন ক্ষমতা ছিলনা, পরকালেও তাঁর কোন ক্ষমতা থাকবেনা।

দেওবন্দী মাযহাবের দ্বিতীয় ইমাম মৌলভী কাশেম নানুতবী-কাদিয়ানী ঃ

মৌলভী কাশেম নানুতভী সাহেব মৌলভী মুমলুক আলীর শিষ্য ছিলেন। মৌলভী মুমলুক আলী সাহেব মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেবের অসাধারণ ভক্তও ছিলো। তিনি ওহাবী নীতিমালার বাস্তবায়ন লক্ষে নিজ নামকে "মুমলুক আলী" হতে "মুমলুকুল ওলায়" পরিবর্তন করেন। কারণ প্রথম নামটি হযরত আলীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত আর দ্বিতীয় নামটি "ওলা" অর্থাৎ আল্লাহর গুণ বাচক নামের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

দেওবন্দী মাযাবের বাণী দ্বারা হিন্দুস্থানের মধ্যে দেওবন্দী মাযহাব ততটা শিকড় গজাতে পারে নাই। তবে এই মুমলুক আলী মাস্টারের

মাধ্যমে হিন্দুস্থানে ওহাবী মাযহাব প্রচারের জন্য গঙ্গুহী ও নানুতভীকে নির্দেশ দিলেন যে, ওহাবী মাযহাবের শিক্ষা দেয়ার জন্য মাদ্রাসা কায়েম কর। গঙ্গুহী ও নানুতভীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নানুতভীর কাশেম শব্দ এর সংযুক্ত করে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কাশেমুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করে। স্বয়ং মৌলভী কাশেম সাহেব উক্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মনোনিত হন। আর মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন।

মৌলভী কাশেম উক্ত মাদ্রাসাতে হানাফী মাযহাবের অনুকরণে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলে গঙ্গুহী সাহেব পরামর্শ দিলেন যে, হানাফী মাযহাবের সাথে ওহাবী মাযহাবের শিক্ষা দেয়া হউক। হিন্দুস্থানের হিন্দুরা দেখল যে, দেওবন্দ মাদ্রাসাতে ওহাবী আকীদার ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে এবং হিন্দুদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে চলাফেরার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তখন হিন্দুরা আনন্দে উৎফুল্য হয়ে মাদ্রাসায় চাঁদা দেয়া শুরু করল। এমন কি কংগ্রেসের প্রচার কেন্দ্রও সে দেওবন্দ মাদ্রাসায়ই স্থাপন করা হল। আজও মাদ্রাসাটি কংগ্রেসের প্রচার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ধর্ম কুৎসা ঃ মৌলভী কাশেম নানুতভীর পূর্ববং দেওবন্দীগণ মহানবী হযরত রাসূলে করীম (দঃ), সাহাবী, আওলীয়ায়ে কেরামদের শত শত কুৎসা রচনা করেন। তবে সে ক্ষেত্রে নানুতবী সাহেব একটি অন্যতম কুৎসা করেন। সেই কুৎসাটি হল যে, তিনি প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ)-কে শেষ নবী হওয়ার বিশ্বাসী ছিলেন না। জনাব নানুতবী সাহেব বলেন, আওয়াম মানুষেরা হযরত নবী করীম (দঃ) কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন। শেষ নবীর অর্থ এই যে, তিনি তাঁর পূর্ববং সকল নবীগণের পরে আবির্ভাব হন। তবে জ্ঞানীগণ বলেন যে, হযরত নবী করীম (দঃ) শেষ নবী হিসেবে বৈশিষ্ট পূর্ণ ছিলেন না বরং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট ছিল অন্য দিক দিয়া।

অর্থাৎ মৌলভী কাশেম সাহেব প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ) এর শেষ নবী হওয়াকে কোন বৈশিষ্ট মনে করতেন না। (تحذير الناس ص-٣ سطر ١٠) মৌলভী কাশেম নানুতবী সাহেব স্বরচিত উক্ত পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠায় ১৬ লাইনে আরো বলেন, হযরত নবী করীম (দঃ) এর নবুয়তী যুগের পর অন্য কোন নবীর আগমণ ঘটলে মোহাম্মদ (দঃ) এর শেষ নবী হওয়ার অর্থ বিকৃত হয়ে যাবে না? কাশেম সাহেবের এই অপব্যাখ্যা দ্বারা গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানী নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর পর নবী হিসেবে নবুয়তের দাবীদার হল। প্রকৃত পক্ষে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মূল উৎস হল জনাব কাশেম নানুতবী সাহেব। যেই মাদ্রাসার পরিচালকের এইরূপ মনভাব হয় সেই মাদ্রাসার প্রশিক্ষিতদের ঈমান আকীদা কিরূপ হবে? প্রত্যেক পাঠক নিজেরা বিবেচনা করে দেখুন। এই কাশেম নানুতবী উক্ত পুস্তকের ৪ পৃঃ ২১ লাইনে লেখেন নবীগণের আমল আখলাক হতে কতিপয় উম্মতের আমল চরিত্র সমুন্নত ছিল।

দেওবন্দী মাযহাবের তৃতীয় ইমাম মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর জীবনী সংক্ষেপ ঃ

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম অভিভাবক ছিলেন। মৌলভী কাশেম সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি আবার সেই মাদ্রাসার মোহতামিম নিযুক্ত হন। তার আকীদা বিশ্বাস ছিল অত্যান্ত বদ, সেই কারণে সে নিজ এলাকাতে অবাঞ্চিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। অতঃপর সে নিজের বদনামী ঢাকার জন্য হিন্দুস্থানের বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ

করে। যখন কিছু বদনামী লুপ্ত হয়ে গেল তখন নিজ পীরের বাইয়াত ভেঙ্গে মিলাদ ও কেয়ামের মাসয়ালাতে উস্তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। হাজী সাহেব অগত্যা রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। বাইয়াত ভেঙ্গে দেয়ার পর গঙ্গুহী সাহেব রাগের মাথায় পীরে কামেল হাজী সাহেবের "হাপ্ত মাসায়েল' পুস্তক খানাকে পুড়িয়ে ফেলে। নিজ পীর সাহেবের পুস্তক অগ্নিদগ্ধ করার ঘটনা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন আমি রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবের ঈমান, আকীদা ও চরিত্র বর্ণনা করব।

১। আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন, তবে তিনি তা বলেন না।
২। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর অনুরূপ মানুষ সৃষ্টি হতে পারে।
৩। প্রিয় নবী হুজুরে পাক (দঃ) আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন।
৪। মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর চেয়ে শয়তানের জ্ঞান বুদ্ধি বেশী ছিল।
৫। প্রচলিত মিলাদ মাহফিল ও কেয়াম বেদআতে সাইয়েরাহ বা হারাম।

দেওবন্দী মাযহাবের চতুর্থ ইমাম মৌলভী খলিল আহাম্মদ আমবুটির সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবের ভ্রান্ত ও কুফরী আকীদা গুলো স্বরচিত পুস্তক ফতোয়ায়ে রশিদিয়া ও বারাহীনে কাতেয়ায় লিখিত

আছে। রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহীর উস্তাদের প্রণীত তাকদিসুল উকিল গ্রন্থে তার কুফরী মতবাদের সমালোচনা করেন।

মৌলভী খলিল আহাম্মদ আম্বুটি সাহেব মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবের খাচ চামচা ছিল। সে ছিল দেওবন্দী আকীদার গোঁড়া সমর্থক। খলিল সাহেব নিজেই গঙ্গুহীর কুফরী কালামকে সমর্থন করে দিলে ছিলো নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর জ্ঞান বুদ্ধি শয়তানের জ্ঞান বুদ্ধি হতে কম ছিল। তারই প্রচেষ্টায় ভাওয়াল পুরে দেওবন্দী আকীদা বিস্তারিত হয়। সেই ভাওয়াল পুরে মিলাদ ও কেয়ামকে উপেক্ষা করার কারণে নানা ভাবে অপদস্ত হয়। ভাওয়াল পুরে তৎকালে সরকার পরিচালিত জামেয়া আব্বাসিয়া নামী একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। খলিল সাহেব কলে কৌশলে ঐ মাদ্রার শিক্ষক নিযুক্ত হয়। তার পর হতে তিনি স্থানিয় এলাকায় ধীরে ধীরে দেওবন্দী মতবাদ বিস্তার করতে থাকে। ইহা দেখে তৎকালীন সুন্নী আকীদার প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা গোলাম দস্তেগীর সাহেব গঙ্গুহীর রচিত বারাহীনে কাতেয়া পুস্তক খানা সঙ্গে করে নিয়ে ভাওয়াল পুর মাদ্রাসায় উপস্থিত হন। সেখানকার উচ্চ পদস্ত সরকারী কর্মকর্তাগণকে তার ধর্মনাশা পুস্তক খানা দেখান। সরকারী কর্মকর্তাগণ পুস্তকের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিভিন্ন সমালোচনা দেখে অবাক হন।

এদিকে খাজা ফরিদ সাহেব খলিল সাহেবকে পুস্তকের বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা শুরু করেন। আলোচনাতে পরিস্কার ধরা পড়ল যে, তিনি একজন নজদী পন্থী দেওবন্দী ওহাবী। অন্যদিকে মাওলানা দস্তেগীর সাহেব খলিল আহাম্মদ আম্বুটি সাহেবকে আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত করার জন্য লোক পাঠান, কিন্তু ইতি পূর্বে তিনি ভাওয়াল পুর হতে পলায়ন করেন। (তাজকেরাতুল খলিল ১০ পৃষ্ঠা)

দেওবন্দী মাযহাবের শেষ ইমাম মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

জনাব মৌলভী আশ্‌রাফ আলী থানভী সাহেবের জন্মস্থান ছিল থানাবন গ্রামে। তিনি ছাড়া তার অন্যান্য বংশধরগণ সকলেই সুন্নী আকীদা পন্থী ছিলেন। তিনিও প্রথম প্রথম সুন্নী আকীদায় ছিলেন। শেষে মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেবের খপ্পরে পড়ে ওহাবী আকীদা অবলম্বন করেন।

মৌলভী আশ্‌রাফ আলী থানভী সাহেব ইয়াকুব দেওবন্দীর বিশেষ ছাত্র ছিলেন। থানভী সাহেব শিক্ষা সমাপ্তির পর সর্ব প্রথম কানপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসার একজন সাধারণ শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই ইসলামিয়া মাদ্রাসার স্থানীয় অধিবাসীগণ ছিল ঈমান আকীদা বিশ্বাসে একেবারে খাঁটি সুন্নী এবং হাজী এমদাদুল্লাহ্ মোহাজিরে মক্কী (রহঃ) এর অত্যান্ত ভক্ত। থানভী সাহেব সেস্থানে অবস্থান কালে চতুর্দিকে গিয়ে মিলাদ মাহফিল করতেন। থানভী সাহেবের তরীকতের পীর ছিলেন তৎকালীন অতি প্রসিদ্ধ আলেম হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী (রহঃ) তিনি সদা সর্বদা পীর সাহেবের খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন এবং হাজী সাহেবের সঙ্গে মিলাদ অনুষ্ঠানে মিলাদ কেয়াম করতেন।

একবার মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব থানভী সাহেবের নিকট একটি চরম পত্র প্রেরণ করে অবগত করান যে, মিলাদ কেয়াম যখন বেদআত ও শিরিক তখন কানপুরে উহাকে যেভাবে হউক তুমি হারাম প্রমান কর। অথবা কানপুর ছেড়ে দিয়ে থানা বনে পীর সেজে বসে যাও। এই নির্দেশের পর কানপুর ছেড়ে তিনি থানাবনে এসে আস্তানা কায়েম

করেন। এখান হতে তিনি একটানা প্রিয়নবী হুজুরে পাক দঃ) ও সাহাবা কেরামদের বিরুদ্ধে ফতোয়া রচনা করতে থাকেন। তার নবুয়ত বিরোধী ফতোয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ফতোয়া হল এই যে, তিনি মহানবী রাসুলে পাক (দঃ)-কে ক্ষুদ্র জ্ঞানী বলেছেন।

থানভী সাহেব দু'জন যোগ্য যোগ্য বেতনধারী কেরানী রেখে ছিলেন প্রথম জনের নাম ছিল মাওলানা শিব্বির আলী দ্বিতীয় জনের নাম মাওলানা জামিল আহাম্মদ। যতদিন থানভী সাহেবের আল এমদাদ ও আল মাবলিগ মাসিক পত্রিকা দু'টি চালু ছিল ততদিন এই দু'জন আলেম উক্ত দু'খানা পত্রিকার সম্পাদন করতেন। যখন পত্রিকা বন্দ হয়ে গেল তখন তারা দু'জন কোরআন, হাদীস, ফেকাহ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিতাব রচনা করে জনাব থানভী সাহেবের নামে প্রকাশ করতে লাগলেন। আজ কাল যতগুলো কিতাব থানভীর নামে প্রকাশিত হয়েছে উহা উক্ত দু'জন আলেমের প্রনীত শুদ্ধ কিতাবের জ্বলন্ত নিদর্শন।

জনাব শিব্বির আলী ও জামিল আহাম্মদ (রহঃ) থানভী সাহেবের মৃত্যুর পরও থানা বনে বসে বহু কিতাব আদি স্বহস্তে লিখে থানভী সাহেবের নামে প্রকাশ করেন।

আশরাফ আলীর ঘোষনা মতে মহানবী (দঃ) ক্ষুদ্র জ্ঞানী ছিলেন ঃ

(معاذ اللہ) آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم
کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر
یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ۔

اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید - عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لئے بھی حاصل ہے (حفظ الایمان مصنفہ اشرف علی تھانوی مطبوعہ دیوبند صفحہ ۸ ۔)

আশরাফ আলী থানভী সাহেব বিশ্বনবী হাবীবে খোদা হুজুরে পাক (দঃ) বিজ্ঞ ছিলনা মন্তব্য করে একটি চ্যালেঞ্জ দেন। থানভী সাহেব বলেন যদি কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, প্রিয়নবী হুজুরে পাক (দঃ) বিজ্ঞ ছিলেন, সেই দাবীর বিপক্ষে আমি থানভী বলব যে, নবী (দঃ) ক্ষুদ্র জ্ঞানী ছিলেন। কারণ জ্ঞান শ্রেষ্টত্বের ও ক্ষুদ্র জ্ঞানের মানদন্ড দু'প্রকার। প্রথম প্রকার হল শ্রেষ্টতম জ্ঞান। এই জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ পাক। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হল সামান্য বা ক্ষুদ্র। প্রথম প্রকারের জ্ঞানের মধ্যে কারো অর্ন্তভূক্তি শিরিক।

অতএব মহানবী হুজুরে পাক (দঃ) এর জন্য যে ক্ষুদ্র জ্ঞান ধার্য্য করা হয়েছে উহাতো যায়েদ, আমর, শিশু, পাগল এমন কি সমস্ত বে-জবান জীব জন্তুরও তো অর্জিত আছে। এই ক্ষুদ্র জ্ঞানী হওয়ার দ্বারা নবী (দঃ) বৈশিষ্ট্য কোথায়! (হেফযুল ঈমান ৮পৃঃ)

এই চ্যালেঞ্জের মূল কারন ঃ

১। নবী (দঃ) আমাদের মত মানুষ এবং সাধারণ মানুষ ছিলেন বলে মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সাহেব যে চ্যালেঞ্জ করেন সেই চ্যালেঞ্জকে তাকদীসুল উকিল নামের সুন্নী গ্রন্থে খন্ডন দ্বারা প্রমানীত হয় যে, প্রিয়নবী হুজুরে পাক (দঃ) সাধারণ মানুষ ছিলেন না বরং অদ্বিতীয় রাসূল ছিলেন। এই খন্ডন নীতি দ্বারা গঙ্গুহী সাহেব অপমানও লাঞ্জনার হয়ে ঘরে বসে যান। থানভী সাহেব নবী (দঃ) কে ক্ষুদ্র জ্ঞানী বলে গঙ্গুহী সাহেবের অপমানের প্রতিশোধ নিলেন এখানে।

২। আশরাফ আলী থানভী সাহেব উল্লেখিত কটুক্তি করে একথা বলতে চান যে, নবী (দঃ) ক্ষুদ্রজ্ঞানী ছিলেন আর তিনি একাই অজ্ঞাত জ্ঞানী ছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন একাই হেকিমুল উম্মত বা মোজাদ্দেদ মিল্লত।

নোট ঃ মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব যে বলেছেন বিশ্বনবী (দঃ) জ্ঞান শ্রেষ্টত্বের অধিকারী ছিলেন না, তার এই মন্তব্যটি একটি কুফরী কালাম মাত্র। আর থানভী সাহেব জীব জন্তুর সঙ্গে বিশ্বনবী (দঃ) কে উপমা সহকারে তুলনা করাতে তিনি ধর্ম চ্যুত হয়ে গেলেন নিসন্দেহে। তাকে যে ব্যক্তি মুসলমান ছিল বলে দাবী করবে সেও নিসন্দেহে কাফের হয়ে যবে।

থানাবনের আশরাফ আলী খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে শয়তানের সাথে উপমা দিয়ে কটুক্তি করেন। তিনি বলেন এই দু'মহান ব্যক্তিত্বের ছবিতে শয়তান আবৃত হতে পারে। (ইফাযা ৬খন্ড ১৮২ পৃঃ)

জনাব আশরাফ আলী থানভী সাহেব প্রিয়নবী হুজুরে পাক (দঃ) এর মদীনা মোনাওয়ারার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে বলেন যে, তার থানাবনের মর্যাদা মদীনার অনুরূপ। এই মর্যাদার দুটি কারণ দেখান, তিনি এখানে প্রথম কারণ এই যে, থানাবনে তার পীর সাহেব পদার্পন করেন। দ্বিতীয় কারণ স্বয়ং তিনি থানাবনে আস্তানা পেতেছিলেন। (ইফাযা ৪খন্ড ২৭০ পৃঃ)

نواب جمشید علی خان تھانوی طلب کیا کہ حضرت! حدیث میں قبروں پر عمارت بنانے کی ممانعت تو معلوم ہے! جب نبی کریم (ص) کے روضہ پر گنبد بنا ہوا ہے تو کیا جائے۔
الجواب : اسے گرا دینا واجب ہے۔ فقط اشرف علی
(الافاضات الیومیہ ج ۶ ص ۱۹۰ سطر ۲۲ ۔

অনুবাদ ঃ নবাব জমসিদ আলী খান জনাব আশরাফ আলী থানভী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলো, হুজুর! হাদীস শরীফের মধ্যে

কবরের উপর ঘর নির্মানের নিষেধাজ্ঞা এসেছে কিন্তু নবী (দঃ) এর রওজা শরীফের উপর যে, গোম্বোজ নির্মিত আছে তা কি করা হবে।

ফাতোয়া ঃ জনাব আশরাফ আলী থানভী সাহেব নবী (দঃ) এর রওজা শরীফের উপর যে কোববা নির্মিত আছে তা ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজিব বলে ফতোয়া প্রদান করেন।

○ فتاوی رشیدیہ جلد ۱۱۲) پختہ قبر و قبہ بنانا حرام ہے

ফাতোয়া ঃ দেওবন্দ মাদ্রাসার ফতোয়া লেখক মৌলভী আজিজুর রহমান ফতোয়া দেন, জিয়ারত উদ্দেশ্যে আজমীর শরীফ গমন কারী ব্যক্তি হত্যাযোগ্য এবং জেনায় লিপ্ত হওয়া ব্যক্তির ছেড়ে বেশী পাপিষ্ঠ।

(تجلیہ اعمال نے دین ص—۹۳ پٹھان کوٹ) ·

থানভী ও থানাবন এর মর্যাদা

○ মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর একজন অতি ভক্তের শক্ত মুরীদ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একদা আমি থানাবনের রাস্তা কুড়াতে ছিলাম হঠাৎ আমার সম্মুখে একজন মানুষ উপস্থিত হল যার পায়ের হাটুর নীচের অংশ ঝকঝক করছিল ইহা দেখে আমি ধারনা করলাম তিনি নিশ্চয়ই নবী করীম (দঃ) হবেন। এই দেখে সেই মুহূর্তেই আমি তার কদমবুচি শুরু করলাম। তখন তিনি বললেন অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে মাথা উঠাও। আমি মাথা উঠায়ে দেখি যার পাবুচি করছি তিনি আমার পীর আশরাফ আলী থানভী সাহেব। তখন হতে আমার আস্থা হল যে, আমার পীর সাহেব মহানবী (দঃ) হতে কোন দিকে মর্যাদায় কমনন। (আসদাকুর রোইয়া ১৫ পৃঃ ১২ লাইন)

এই অতি শক্তের ভক্ত মুরীদ আর একটি স্বপ্নের ঘটনা বলেন। আমাদের একটি নিয়ম আছে যে, আমরা তাবলীগি নেসাব অনুরূপ 'হাসনুল আজিজ রেসালা থানার কিছু অংশ হলেও তেলাওয়াত করে ঘুমাই। আমি এই নিয়ম পালন করে একরাতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে দেখি যে, আমি "ফরফর' "ফরফর" করে কালেমা পাঠের মধ্যে রাসুলুল্লাহ বাক্যের স্থানে পীর কেবলার নাম উচ্চারণ করতেছি। তখন জাগ্রত হয়ে কয়েকবার আউযুবিল্লাহ পাঠ করে পুনঃবার ঘুমায়ে পড়ি। পুনঃবার শয়তান এ বিকল্প কালেমাটি আমার মুখে উচ্চারণ করাচ্ছে। সেই রাতে তিনবার আমি শয়তানী কালেমাটি বারংবার পাঠ করি। খুব সকালে ঘুম হতে উঠে পীর কেবলার থানাবনের আস্তানায় গিয়ে ধন্যা ধরি। পীর সাহেব আমার মুখে স্বপ্নের ঘটনা বিস্তারিত ভাবে শুনে এই স্বপ্নের তাবীর দিলেন।

اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف رجوع کر
تے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے (رسالہ الامداد
اشرف علی تھانوی بابت ماہ صفر ۱۳۳۶ ص—۳۵ · سطر ۱ ·)

তুমি কালেমা পাঠের যেই বিকল্প স্বপ্ন দেখেছ উহা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে শান্তনা দিচ্ছেন, ইহা দ্বারা বিচলিত হওয়ার কিছু নাই। আরে স্বপ্ন ছাড়াও তুমি যার দিকে রজু হও সে অত্যন্ত ধার্মীক। (নাউজুবিল্লাহ)

স্বপ্নের ঘটনাটি মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব ১৩৩৬ হিজরী সনে তার স্বপ্রকাশিত "আল এমদাদ' পত্রিকার ছাপার পর সাধারণ মানুষ তাকে কাফের নামে আখ্যায়িত করে। দেওবন্দী মাযহাবের চতুর্থ ইমাম মৌলভী খলিল আহাম্মদ আম্বুটি সাহেব দিশাহারা হয়ে দেরী না করে থানভী সাহেবের আস্তানায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু থানভী সাহেবকে পেলেন না। অবশেষে থানভী সাহেবের ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হলেন তিনি সেখানে তার সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেল। মাহফিলের মধ্যে খলিল সাহেব থানভী সাহেবের কানে কানে বললেন, হুজুর। মানুষ আপনাকে কাফের বলছে। আপনি নিজের ভুল তাবীরের সুরাহা এখানেই করে ফেলুন। নচেত আমাকে বলুন আমি স্বপ্নের সঠিক তাবীরটি প্রকাশ করে দেই। খলিল সাহেবের এই উপদেশ বাণীর উপর থানভী ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন :

اگر ایسا ہوا تو میں جلسہ سے اٹھکر چلا جاؤنگا
(اشرف المعمولات تھانوی صـ۱۷ سطر۳)

হে খলিল! এই মুহূর্তে আমাকে যদি অতি বিরক্ত কর তবে আমি মজলিস ত্যাগ করে চলে যাব। কুফরী করছি আমি, তোমার কেন এত মাথা ব্যাথা। এবার খলিল সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আপনি আস্ত৷ কাফের। আপনার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। এই বলে মৌলভী খলিল আহাম্মদ সাহেব দেওবন্দ এলাকা ছেড়ে সাহারণ পুর মাদ্রাসার শিক্ষক হয়ে গেলেন।

দেওবন্দীগণ তিন দলে বিভক্ত ঃ

প্রথম দল ঃ মৌলভী খলিল আহাম্মদ আম্বুটি সাহেব প্রথমেই তিনি মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেবকে কাফের ফতোয়া দেন। তাঁর সঙ্গে এক বিরাট দেওবন্দী দল একাত্মতা প্রকাশ করেন। الترجیح الراجح صـ۵۲

দ্বিতীয় দল ঃ দ্বিতীয় দল হল মধ্যম পন্থীদল। এই দলের লোকেরা আশরাফ আলী থানভী সাহেব হতে আকীদা ছিন্ন করলনা আবার তার পূর্ণ সহযোগীতাও করলনা। যেমন এতদ্দেশের গোলফী সুন্নীগণ থানভীর সম্বন্ধে ভাল মন্দ কোন অভিমত প্রকাশ করেন না। الساکت فہو شیطان اخرس عن الحق যারা জেনে শুনে হক কথা প্রকাশ করেনা তাদেরকে মহানবী হুজুর (দঃ) বোবা শয়তান নামে আখ্যা দিয়েছেন। (الترجیح الراجح تھانوی صـ۳۰ - سطر۱۷)

তৃতীয় দল ঃ এই দলের মধ্যে রয়েছেন মহামান্য আদিম দেওবন্দীগণ। তারা থানভী সাহেবের কুফরী স্বপ্নকে গায়ের জোরে ইসলামী স্বপ্ন বলে থাকেন। এই দলের অভিমত হল এই যে, যদি কেহ কালেমার মধ্যে

মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এর স্থলে ইচ্ছে করে আশরাফ আলীর নাম ব্যবহার করে তবে নিঃসন্দেহ কুফরী কালাম। এখানেতো থানভী সাহেবের মুরীদই স্বপ্ন দেখেছে কাফের হলে সেই হবে। থানভী কেন কাফের হবে?

প্রথম দল এই প্রশ্নের জবাব দেন যে, থানভী সাহেবতো স্বপ্ন দেখে কাফের হন নি, বরং স্বপ্নের মনগড়া তাবীর দেয়ার কারণে সে কাফেরে পরিণত হয়েছেন।

মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর ফতোয়ায় সকল দেওবন্দী কাফের ঃ

(۱) اب لو اکفر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسلمان ہوئے
پھر مرتد ہوگئے (افاضات جـ۴ صـ۱۸۶ - سطر۱۱)

জনাব মৌলভী আশরাফ আলী থানভী প্রথম দলের কুফরী ফতোয়া প্রাপ্তির পর তিনি ক্ষিপ্তহয়ে সকল দেওবন্দীকে প্রথমে কাফের বললেন পরে ধর্মচ্যুত্য ও বললেন। তখন দেওবন্দীগণ প্রশ্ন করলেন হে থানভী সাহেব! আপনি মুসলমান দেওবন্দীগণকে কাফেরে পরিণত করলেননি কেন। থানভী সাহেব প্রতি উত্তরে বললেন, দেওবন্দীগণতো প্রথমে মুসলমান ছিল, অতঃপর ধর্মচ্যুত্য হয়ে যায়। অর্থাৎ আমিও তোমাদের নিকট প্রথমে খাঁটি মুসলমান ছিলাম। আর এখন শেষ জীবনে কাফের হলাম কেন?

(۲) کفر کے لئے ایک بات کافی ہے کیا کفر کے ایک
بات سے کافر نہ ہوگا؟ (افاضات جـ۴ صـ۳۹ - سطر۵)

দেওবন্দীগণ পুনঃ প্রশ্ন করলেন ঃ আপনাকে শুধু একটি স্বপ্নের ভুল তাবীর দেয়ার কারণে আমরা কাফের বলেছি। থানভী সাহেব বললেন মানুষ কাফের হওয়ার জন্য একটি কুফরী কথাই যথেষ্ট।

(৬) کافر تو وہ خود بنے ہیں ۔ اب صرف بتلایا جاتا ہے
(افاضات جـ ۲ ۔ صـ ۳۱۸ ۔ سطر ۱۲)

দেওবন্দীগণ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, হে থানভী সাহেব! আপনি সকল দেওবন্দীদেরকে বিনা কারণে কাফের বানাচ্ছেন।

জনাব থানভী সাহেব বললেন দেওবন্দীগণ প্রথম হতেই কাফের বনে রয়েছে। তবে আমি এখন তাদের কাফের হয়ে যাওয়ার কথাটা প্রকাশ করছি মাত্র।

(৭) ایسا سمجھنے والا شخص بھی کافر ہے جو کفر کو کفر نہ کہے (افاضات جـ ۲ صـ ۳۱۸ ۔ سطر ۱۶)

দেওবন্দীরা বললেন: দেওবন্দীরা কাফের হউক অথবা মুসলমান হউক আপনি তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিলে কোন ফায়দা হচ্ছে?

জনাব থানভী সাহেব বললেন: কোন কাফেরের কুফরী কার্য্য করতে দেখেও তাকে কাফের না বললে নিজেই কাফের হতে হয়!

উপরে উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রমানীত হল যে, জনাব মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব দেওবন্দীগণের মধ্যে একা খাঁটি ঈমানদার ছিলেন।

সমাপ্ত

সুন্নী আকীদা - বিশ্বাস মোতাবেক লিখিত
আমাদের কতিপয় ধর্মীয় পুস্তক

সহীহ মুরাদুল মোমেনীন

সাধারণ মুসলিম নর-নারীদের ধর্মীয় শিক্ষার অদ্বিতীয় ও প্রশংসনীয় পুস্তক

শানে মোহাম্মদ (দঃ)

নূরে মোহাম্মদীর জন্ম হতে তাঁর সকল প্রকার জাহেরী ও বাতেনী শানের জ্বলন্ত নিদর্শন।

হাকীকতে খানায়েকাবা

কাবা ঘর হতে বিশ্বজগত সৃষ্টি এবং কালো পাথর হতে হারাম শরীফ ও কাবার পরিচিতি।

যুক্তিতে ধর্মীয় বিধান

যুক্তিতে ধর্ম পালনের মূল উৎস

সুন্নী পরিচয়

ধর্মের দৃষ্টিতে বেহেশতী ফেরকা ও দোযখী ফেরকার সঠিক পরিচয়

ওহাবী পরিচয় ঃ

হাদীসে রাসূলে ওহাবী ফেরকার সঠিক দিক এবং মিলাদ ও কেয়াম পালন করার মহা ফজিলত

নকশে সোলায়মানী

ইহা পরিক্ষিত ও প্রশংসনীয় তাবীজ - তুমার এর বই

তিন সূরা

সাধারণ মানুষের তেলাওয়াতের জন্য উচ্চারণ ও অর্থ সহ সূরা ইয়াসীন,
সূরা রহমান ও আয়াতুল কুরসী

নূরে এলাহী পাঞ্জে সূরা ও দোয়া দরূদ

উচ্চারণ ও অর্থসহ সূরা ইয়াসীন, সূরা রহমান, সূরা ওয়াকেয়া, সূরা মুলক, সূরা মুজাম্মিল,
এবং আসমা-উল-হুসনা, আসমা-উন-নবী, দোয়ায়ে হাবিবী, দরূদে তাজ, দরূদে এলাহী ও মুনাজাত

নূরে মোহাম্মদী পকেট নামাজ শিক্ষা

সহজ পদ্ধতিতে নামাজ শিক্ষার বই